৮

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল
Data Collection Strategies

নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ উপাত্ত সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন একটি গবেষণার সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গবেষণায়, উপাত্ত সংগ্রহের চারটি প্রধান কৌশল রয়েছে — পর্যবেক্ষণ, স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার এবং দলিলপত্র বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি মৌলিক কৌশল হলো পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক হতে পারে, আবার ন-অংশগ্রহণমূলকও হতে পারে। গবেষক যখন সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন না, তখন তিনি উত্তরদাতাদের কাছ থেকে হয় স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা, বা সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু যদি প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ না থাকে, বা প্রয়োজন না পড়ে, সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলিলপত্র ও ঐতিহাসিক উৎসে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। যদিও গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ, সময়, গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত উপাত্তের ধরণ ও বিশ্লেষণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়ে থাকে, তবে সূক্ষ্ম ও সাধারণীকরণযোগ্য উপাত্ত উৎপাদনের জন্য বহু-পদ্ধতির সংমিশ্রণ অধিকতর কার্যকর ফলাফল প্রদান করে।

এই ইউনিটে আমরা যে পাঠগুলো অধ্যয়ন করবো, সেগুলো হলো:

- পাঠ - ১ : উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পাঠ - ২ : পর্যবেক্ষণ
- পাঠ - ৩ : স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা
- পাঠ - ৪ : সাক্ষাৎকার
- পাঠ - ৫ : দলিলপত্র বিশ্লেষণ

পাঠ - ১

উপাত্তের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
Sources of Data and Methods of Data Collection

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- উপাত্ত কী
- উপাত্তের ধরণ ও উৎস
- উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- মাধ্যমিক উৎসের ব্যবহার
- বহু-পদ্ধতির সংমিশ্রণ

উপাত্ত কী (What is Data)?

যে কোন গবেষণাই উপাত্ত সংগ্রহ এবং এর বিশ্লেষণের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা সেটি অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, বা অন্য যে কোন কৌশলের মাধ্যমেই করা হোক না কেন। সাধারণভাবে, উপাত্ত হলো তথ্য বা সংখ্যারাশি, যা থেকে উপসংহার টানা সম্ভব। এ সকল তথ্য বা সংখ্যারাশি গবেষকদের দ্বারা গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, উপাত্ত যে কোন অভিব্যক্তি, বা ঘটনার উপর তথ্য, বা সংখ্যারাশির অতিরিক্ত একটি বিষয়। গবেষণা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, এমন অতীত এবং বর্তমানের সব প্রাসঙ্গিক উপাদানই হলো উপাত্ত। সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে, ব্যক্তির মানসিক ও আবেগপ্রসূত প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তি, কর্মকান্ড, মনোভাব ও মূল্যবোধের সাথে জড়িত জীবন্ত উপাদানগুলোকে উপাত্ত বলে অভিহিত করা হয়। তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপাত্তকে অবশ্যই একটি উচ্চ মাত্রার সূক্ষ্মতায় পরিমাপকৃত হতে হবে এবং সংখ্যাসূচক উপাত্ত তখনই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে, যখন তা একটি সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হবে।

গবেষণার জন্য সংগৃহীত উপাত্ত গবেষণার সময়ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন,

- উপাত্ত সংখ্যাসূচক হতে পারে, শব্দ দ্বারা গঠিত হতে পারে, বা দু'টোর সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।
- উপাত্ত মৌলিক হতে পারে, যা পূর্বে সংগৃহীত হয় নি, বা গৌণ হতে পারে, যা অন্যের দ্বারা পূর্বে সংগৃহীত হয়েছে এবং যা গবেষকের দ্বারা পুনঃব্যবহৃত হতে পারে।
- উপাত্ত কোন প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকারের উত্তর, টীকা, বা অন্য পর্যবেক্ষণ, বা পরীক্ষণের প্রতিবেদন, বা দলিল, বা সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।

উপাত্তের ধরণ ও উৎস (Types and Sources of Data)

যখন উপাত্তকে সরাসরি উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তখন সেগুলোকে প্রাথমিক উপাত্ত বলে।

উপাত্ত প্রধানতঃ দু'ধরণের হয়ে থাকে — প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্ত। যখন উপাত্তকে সরাসরি উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তখন সেগুলোকে প্রাথমিক উপাত্ত বলে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, যদি একজন গবেষক কোন একটি বিশেষ ভৌগলিক এলাকার শিশু মৃত্যু হার সম্পর্কে জানতে চান, সে ক্ষেত্রে গবেষক সরাসরি সেই এলাকায় যাবেন এবং সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানের মধ্যে কতজন পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে, সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে শিশু মৃত্যু হার নির্ণয় করবেন। শিশু মৃত্যু হার নির্ণয়ের বিকল্প উপায়টি হলো, সেই এলাকার বিদ্যমান জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন তথ্য ব্যবহার করে শিশু মৃত্যু

হার নির্ণয় করা। যখন কোন প্রতিবেদন বা সংগৃহীত উৎস থেকে উপাত্ত ব্যবহার করা হয়, তখন সেগুলোকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে।

সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংগৃহীত উপাত্তের প্রকাশিত প্রতিবেদন, অপ্রকাশিত কর্মপত্র (worksheets), ট্যালি-টেপ, ইত্যাদিকে উপাত্তের প্রাথমিক উৎস বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, উপাত্তের সঠিকতার মাত্রা কতটুকু এবং প্রতিবেদনটি কিভাবে সংগঠিত করা হয়েছে, প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর মধ্যে এ সব বিষয় বর্ণিত থাকতে পারে। প্রাথমিক উপাত্তকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বর্ণনামূলক বা বিশ্লেষণমূলক বিষয়বস্তুও প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হতে পারে। এ ছাড়াও, লেখচিত্রের মাধ্যমে উপাত্তের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তবে প্রাথমিক উৎসে উপস্থাপিত উপাত্তের কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎসে (যেমন, তথ্যবিবরণী, পরিসংখ্যানগত সার-সংক্ষেপ, পরিসংখ্যানগত বর্ষপঞ্জী, ইত্যাদি) পুনঃপ্রকাশিত হতে পারে। অন্যান্য যে সকল মাধ্যমিক উৎসে এ ধরণের কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়, সেগুলো হলো গবেষণা পত্রিকা, গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা প্রতিবেদন, ইত্যাদি। জন্ম, মৃত্যু ও স্থানান্তরের হার, জীবন সারণি, প্রাক্কলন, প্রক্ষেপণ, ইত্যাদি হলো প্রাথমিক উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত এ ধরণের কিছু পরিসংখ্যান।

মাধ্যমিক উপাত্ত ও উপাত্তের মাধ্যমিক উৎস চিহ্নিত করা সহজ। কিন্তু প্রাথমিক উপাত্ত ও উপাত্তের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কখনো কখনো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে, গবেষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি যে উপাত্ত ব্যবহার করতে চান, তা তার গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। যদি উপাত্তের গুণগত মান গ্রহণযোগ্য হয়, সে ক্ষেত্রে অর্থ, সময়, ও শ্রম সাশ্রয়ের জন্য মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাত্ত ব্যবহার করা বাঞ্ছণীয়। মাধ্যমিক উপাত্তের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। যেমন, আদমশুমারী প্রতিবেদন, নমুনা জরিপ প্রতিবেদন, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তিগত রোজনামচা, ঐতিহাসিক দলিলপত্র, ইত্যাদি। তবে একাধিক উৎস থেকে উপাত্ত ব্যবহার করেও গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করা যেতে পারে। যেমন, গবেষক প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে সেই উপাত্তকে মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের সাথে তুলনা করে দেখতে পারেন যে, তার উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু।

উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি (Methods of Data Collection)

সামাজিক গবেষণায় সাধারণতঃ চারটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং একটি গবেষণায় অনেক সময় একাধিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে, সামাজিক গবেষণায় সাধারণতঃ চারটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য যে সকল পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো এই চারটি পদ্ধতিরই বিভিন্ন সংস্করণ। সেই চারটি পদ্ধতি হলো:

- পর্যবেক্ষণ
- স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা
- সাক্ষাৎকার
- দলিলপত্র বিশ্লেষণ

এই চারটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য যতটা না হলো 'এটি বা ওটির' মত সুস্পষ্ট, তার চেয়ে বেশী হলো উপাত্ত সংগ্রহের নির্দিষ্ট কৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করার বিষয়টি। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে একদিকে যেমন গবেষক ঘটমান সামাজিক কর্মকান্ডকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন, অন্যদিকে তেমন তিনি অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেন। একইভাবে, স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীরা গবেষকের পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকেন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সকল তথ্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সর্বোপরি, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে দলিল পত্রের বিশ্লেষণ সবসময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি নির্বাচন মূলতঃ প্রত্যাশিত উপাত্তের ধরণের উপর নির্ভর করে। ধরা যাক, কতগুলো ঘটনার পারম্পর্যকে অনুসন্ধানের জন্য এবং ঘটনাগুলো ঘটবার সময়, পূর্বে ও পরে অংশগ্রহণকারী বা অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সে সকল ঘটনার অর্থকে ব্যাখ্যার জন্য, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি, বিশেষ করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদি গবেষক কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, রীতি নীতি এবং মর্যাদাকে গবেষণা করতে চান, তবে সেই গোষ্ঠীর ভিতরের বা বাইরের তথ্য প্রদানকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি।

পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও দলিলপত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুকল্প ও প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য যথাযথ এবং এগুলো কোন গোষ্ঠী ও ঘটনাকে বর্ণনার পাশাপাশি, তাত্ত্বিক আরোহের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাত্ত্বিক অবরোহের জন্য, বা কোন তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে আহরিত নির্দিষ্ট অনুকল্প পরীক্ষার জন্য, কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার ও স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা পদ্ধতি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যথাযথ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়। গবেষক যখন একটি গবেষণায় ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মতামত, বিশ্বাস, ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সংখ্যা, অনুপাত, সমানুপাত, বা অন্যান্য পরিমাণগত তথ্য নির্ধারণ করতে চান, তখন সাক্ষাৎকার ও স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালার ব্যবহার হলো উপাত্ত সংগ্রহের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি প্রমিত উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু যখন গবেষক কতগুলো নির্ভরশীল চলকের উপর কিছু নির্দিষ্ট স্বাধীন চলকের প্রভাব পরিমাপ করতে চান, তখন সাক্ষাৎকার ও স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা হলো উপাত্ত সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় চলকসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন গবেষককে স্বাধীন চলকগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে।

মাধ্যমিক উৎসের ব্যবহার (Use of Secondary Sources)

আমরা জানি যে, পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, বা পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা একজন সামাজিক গবেষকের সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত হয় নি, এমন উপাত্তকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মাধ্যমিক উপাত্তকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

- অভিব্যক্তিমূলক দলিলপত্র (Expressive Documents)
- গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন (Media Reports)
- সরকারী নথিপত্র (Official Records)

সামাজিক বিজ্ঞানীরা উপাত্তের মাধ্যমিক উৎসগুলোকে তিনভাবে ব্যবহার করে থাকেন। *প্রথমতঃ*, একটি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাত্তের সরবরাহকারী হিসাবে। *দ্বিতীয়তঃ*, একটি গবেষণার জন্য আংশিক উপাত্ত হিসাবে। অর্থাৎ, যে সকল চলকের উপর গবেষক উপাত্ত সংগ্রহ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন, সে সকল চলকের জন্য সম্পুরক উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। *তৃতীয়তঃ*, গবেষক তার গবেষণার জন্য সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্তের ব্যাখ্যা, যথার্থতা ও পরীক্ষার জন্য মাধ্যমিক উপাত্তকে ব্যবহার করেন। এই তিন ধরণের মাধ্যমিক উপাত্তকে নিম্ন থেকে উচ্চ মাত্রার নির্ভরযোগ্যতা এবং পূর্ব-পরিমাণগত মাপনীর মধ্যে স্থাপন করা যায়। নিম্ন থেকে উচ্চ মাত্রার নির্ভরযোগ্যতা বলতে উপাত্তের সঠিকতা ও পুনরাবৃত্তির জন্য প্রতিনিধিত্বশীলতার মাত্রাকে বোঝানো হয়েছে এবং পূর্ব-পরিমাণগত মাত্রা বলতে, উপাত্ত কি মাত্রায় সারণিবদ্ধ করার জন্য পরিমাপ করা যায় তাকে বোঝানো হয়েছে। মাধ্যমিক উপাত্তের উৎসের সাথে তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও পরিমাণগত পরিমাপযোগ্যতার মাত্রার সম্পর্কটি ছক ৮.১.১ - এ দেখানো হলো।

ছক ৮.১.১: মাধ্যমিক উপাত্তের উৎস ও তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও পরিমাণগত পরিমাপযোগ্যতার মাত্রার সম্পর্ক

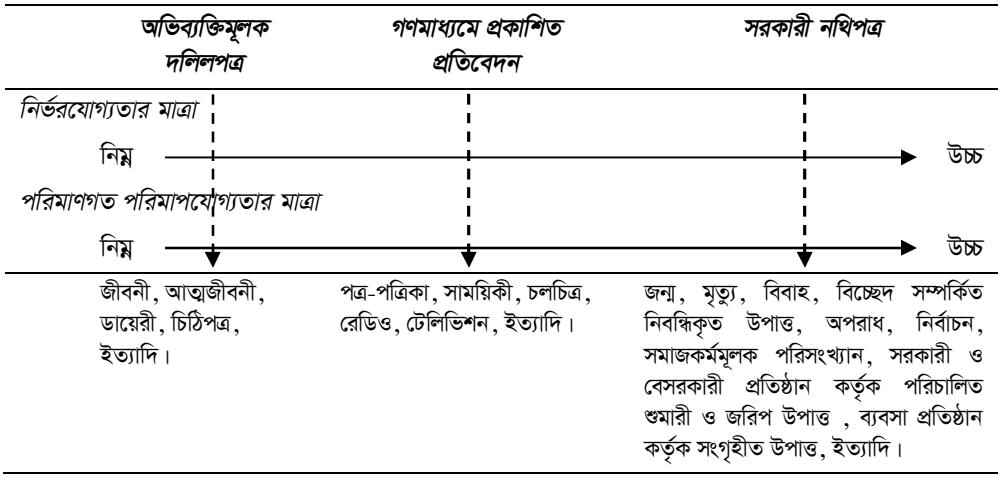

এই মাপনী অনুযায়ী, অভিব্যক্তিমূলক দলিলপত্রে কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যাকে প্রতিফলিত করে। এ সকল উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা খুবই নিম্ন হয়ে থাকে। কারণ, লেখক এ সকল অভিব্যক্তিমূলক দলিলপত্রের মধ্যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে যেভাবে উপস্থাপন করেন, অন্য একজন একই ঘটনা একই রকমভাবে বর্ণনা করবেন না। ফলস্বরূপ, এগুলোর পরিমাণগত পরিমাপও খুব নিম্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এ সকল ত্রুটি থেকে কিছুটা মুক্ত থাকে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, লেখক বা প্রতিবেদকের কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকলেও সেই লেখক বা প্রতিবেদককে সম্পাদক, সহকর্মী ও জনমতের চাপের কারণে কিছুটা হলেও বস্তুনিষ্ঠ হতে হয়। কাজেই, অভিব্যক্তিমূলক দলিলের তুলনায় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাংবাদিক বস্তুনিষ্ঠ নৈতিকতার মানদন্ড অনুসরণ করলেও কোন ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক হবে, তার নির্বাচক ও ব্যখ্যাকারী থাকেন তিনি নিজেই। অন্যদিকে, সরকারী নথিপত্র হলো সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছ-অনিচ্ছা ও পক্ষপাতমূলক লিপিবদ্ধকরণ থেকে মুক্ত। এ সকল উৎস থেকে সংগৃহীত উপাত্ত অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, সঠিক এবং পরিমাণগতভাবে পরিমাপযোগ্য।

বহু-পদ্ধতির সংমিশ্রণ (Multi-Method Mix)

আমরা জানি যে, যে কোন গবেষণা প্রকল্পের শুরুতেই গবেষককে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো উপাত্ত সংগ্রহের যথাযথ ও উপযোগী পদ্ধতি নির্ধারণ করা। অর্থাৎ, উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, না কি ডাক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হবে, না কি সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তার নমুনা নির্বাচন ও উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ার নির্মাণের পূর্বেই। পদ্ধতিটি কি গুণগত হবে, না কি পরিমাণগত হবে, উপাত্ত কি প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে, না কি মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত হবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি নির্বাচন সাধারণতঃ গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত সময়, অর্থ, গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং গবেষণার উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, আমরা যদি গৃহহীনদের অভিজ্ঞতার উপর গবেষণা করতে চাই, তবে সে ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি বেশী উপযোগী হয়। সেখানে গবেষক গভীর ও ব্যাপক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, গৃহহীনেরা পথ ঘাটে বসবাস করতে গিয়ে কি ভাবে জীবন পরিচালনা করেন। কিন্তু আমরা যদি ঢাকা শহরের

উন্নয়ন খাতে সরকারের অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে জনগণের মনোভাব জানতে চাই, তবে সে ক্ষেত্রে পরিমাণগত পদ্ধতি হবে যথাযথ। অর্থাৎ, ডাক প্রশ্নমালা কিংবা সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত দিয়ে সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করাই সে ক্ষেত্রে অধিকতর সমীচীন হবে। কারণ, এ পদ্ধতি একটি বড় আকারের প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা প্রদান করবে, যা দিয়ে গভীরতর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, এমন উপাত্তের জন্ম দেবে।

উপাত্ত সংগ্রহের মূল লক্ষ্যটি হলো, উপাত্ত উৎপাদন করা, যা একদিকে, চলমান কর্মকান্ডকে প্রতিফলিত করে এবং অন্যদিকে, তত্ত্বের মূল্যায়ন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সবচেয়ে যথোপযুক্ত কৌশল হিসাবে কাজ করে। অতএব, কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার যথোপযুক্ত হবে, তা গবেষককে খুব সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। সাধারণতঃ, অধিকাংশ গবেষণাতেই পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন, শুরুতে সংহত দল আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় ও শ্রেণী নির্ধারণের পর মূল তথ্যদাতার সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, এবং সবশেষে, ডাক প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বৃহৎ নমুনার উপর জরিপ পরিচালনা করে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য বহু-পদ্ধতির ব্যবহারকে গবেষকের বিবেচনায় রাখা উচিৎ। একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধাটি হলো যে, যদি প্রতিটি পদ্ধতিতে একই ধরণের উপাত্তের জন্ম দেয়, তবে সেই উপাত্তকে নির্দ্বিধায় নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব হবে এবং তা দিয়ে একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর যথার্থতা প্রমাণিত হবে। পদ্ধতিগুলো যত ভিন্ন হবে এবং সমরূপ উপাত্তের জন্ম দেবে, গবেষক উপাত্তের উপর ততবেশী আস্থাশীল হবেন। অতএব, সূক্ষ্ম ও সাধারণীকরণযোগ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বহু-পদ্ধতির মিশ্রণ সবসময় কাঙ্ক্ষিত। তবে, যে সকল গবেষণার প্রকৃতি বহু-পদ্ধতির মিশ্রণকে সম্ভব করে না, সে ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতিকেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

সারাংশ

গবেষণায় উপাত্ত হচ্ছে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার প্রাণ। উপাত্তকে সংখ্যার ভিত্তিতে যেমন প্রকাশ করা যায়, তেমনি সংখ্যা ছাড়াও প্রকাশ করা যায়। তবে, যেভাবেই উপাত্তকে আমরা উপস্থাপন করি না কেন, যদি উপাত্ত সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচিত না হয়, তাহলে তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। উপাত্ত প্রধানতঃ দু'ধরণের হয়ে থাকে – প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত। প্রাথমিক উপাত্ত সংগৃহীত হয়ে থাকে সরাসরি উত্তরদাতার কাছ থেকে। অনেক সময় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্ত এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রতিবেদনও প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, গবেষণা পত্রিকা, গ্রন্থ, প্রতিবেদন, ইত্যাদিতে যে উপাত্ত প্রকাশিত হয়, তা মাধ্যমিক উপাত্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমান পাঠে, আমরা উপাত্ত বলতে কি বোঝায়, উপাত্তের ধরণ ও উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। গবেষণার ধরণের উপর নির্ভর করে কোন ধরণের উপাত্ত কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে যথাযথ ভূমিকা পালন করে, তাও আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। সংখ্যাসূচক উপাত্ত তখনই গুরুত্বপূর্ণ হবে, যখন:

ক. উপাত্ত সংখ্যায় বেশী হবে
খ. উপাত্ত সংগ্রহে অর্থ কম খরচ হবে
গ. উপাত্ত একটি সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হবে
ঘ. উপাত্ত সমাজকে তুলনার জন্য ব্যবহৃত হবে।

২। সামাজিক গবেষণায় সাধারণতঃ:

ক. একটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়
খ. দু'টি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়
গ. তিনটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়
ঘ. চারটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

৩। উপাত্তকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে তখনই, যখন:

ক. সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত এক হয়
খ. প্রতিটি পদ্ধতি একই ধরণের উপাত্তের জন্ম দেয়
গ. শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও দলিলপত্র বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্য এক হয়
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত কী?

২। মাধ্যমিক উৎসের ব্যবহার কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উদাহরণসহ বহু-পদ্ধতির সংমিশ্রণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। বস্তি এলাকার অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কোন পদ্ধতিটি আপনি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ - ২

পর্যবেক্ষণ
Observation

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব
- পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি কী
- পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
- অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ
- অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা
- ন-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ
- নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Observation)

পর্যবেক্ষণ শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অন্যতম পরিব্যাপক কর্মকান্ডই নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য এটি একটি মৌলিক কৌশলও বটে।

বিজ্ঞানের শুরু হয় পর্যবেক্ষণ দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণেই ফিরে আসতে হয়, এর চূড়ান্ত যথার্থতা প্রমাণের জন্য। পর্যবেক্ষণ শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অন্যতম পরিব্যাপক কর্মকান্ডই নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য এটি একটি মৌলিক কৌশলও বটে। আমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি মৌলিক কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণ তখনই একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত হয়, যখন এটি একটি

- গবেষণার কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে,
- নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিকল্পিত হয়,
- নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যবেক্ষণকৃত বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে সাধারণ প্রস্তাবনার সাথে সম্পর্কিত হয়, এবং
- পর্যবেক্ষণগত ফলাফল যাচাই-এর জন্য নির্ভরশীলতা ও যথার্থতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আমাদের চারপাশে যা ঘটছে, তা আমরা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণে সব কিছু ধরা পড়ে না। আমাদের পছন্দ, সতর্কতা, জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা এবং আমরা যে সকল লক্ষ্য অর্জন করতে চাই, এর সব কিছু মিলিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। খুব কম পর্যবেক্ষকই রয়েছেন, যারা সচেতনভাবে পুরো সামাজিক আচরণকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যেমন, আমরা একটি শিল্প কারখানা পরিদর্শনের পর যদি আমাদের পর্যবেক্ষণের উপর রচিত প্রতিবেদনটি যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করি, তবে সামাজিক আচরণের কতটুকু অংশ আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি, তা বুঝতে পারবো। দেখা যাবে যে, খুব কম সংখ্যক প্রতিবেদনেই সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পারস্পরিক যোগাযোগের কৌশল, শ্রমিকের প্রতি ফোরম্যানের আচরণ, বিভিন্ন পদমর্যাদার শ্রমিকদের বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস, ক্রেতাদের সাথে বিক্রয় সহকারীর মিথষ্ক্রিয়া ও অন্যান্য ব্যাক্তিদের সাথে তার আচরণের ভিন্নতা, ইত্যাদি।

তবে এটি ঠিক যে, আমরা অবশ্যই কিছু না কিছু সামাজিক সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং তা পারি বলেই আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সামাজিক পরিস্থিতির সাথে নিজেদেরকে আত্মিকরণ করে থাকি। কিন্তু এটিও ঠিক যে, সামাজিক প্রপঞ্চ বা সম্পর্কসমূহের উপর আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো হলো

নিতান্তই নৈমিত্তিক, সচেতনভাবে পরিকল্পিত নয়। যেমন, আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষমূলক সম্পর্কের লক্ষণগুলোকে বুঝতে পারি, বা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আগত আগন্তুকের উদ্দেশ্যকে অনুমান করতে পারি, কিন্তু সেগুলোকে আমরা সচেতনভাবে সূত্রবদ্ধ করি না। অতএব, সামাজিক আচরণের কতটুকু আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারবো, তা নির্ভর করবে পর্যবেক্ষণের সময় আমরা কতটুকু যত্নশীল হবো, তার উপর। যত্নশীল পর্যবেক্ষণের জন্য সমাজবিজ্ঞানীকে অবশ্যই সুপ্রশিক্ষিত হতে হবে। যদি তিনি একজন ভালো পর্যবেক্ষক হতে পারেন, তবে তিনি তার হাতে অনেক বেশী তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান কার্য শুরু করতে পারবেন। তিনি কখনোই ভুলে যাবেন না যে, তার পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে সামাজিক আচরণ এবং তিনি যদি তা যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তাহলে সহজেই তাঁর উপসংহারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হবেন।

পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি কী (What is Observational Method)?

সামাজিক বিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। কারণ, কোন একটি প্রপঞ্চ, ঘটনা বা বিষয়কে উপলব্ধি করতে হলে, গবেষককে তা দেখা ও শোনার মাধ্যমে অনুভব করতে হয় এবং সে জন্য গবেষককে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনা বা বস্তুর কাছে যেতে হয়। সেটি হতে পারে খুব সাধারণ, অপরিকল্পিত, নৈমিত্তিক ও অনিয়ন্ত্রিত ধরণের পর্যবেক্ষণ, অথবা উত্তরদাতা একটি প্রশ্নমালা কিভাবে পুরণ করছেন, সেটি দেখা এবং প্রতিটি দফা সম্পর্কে কি মন্তব্য করছেন, তা শোনা, অথবা সাক্ষাৎকারের সময় উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা, এবং সাক্ষাৎকারের সময়, বা পরে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উত্তরদাতার মন্তব্য শোনা, অথবা পরীক্ষণের পটভূমিতে অংশগ্রহণকারীদের আচরণকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা। বিষয়টি অনেকটা 'ঘোড়ার বয়স বুঝতে হলে ঘোড়ার কাছে গিয়ে তার দাঁত গুণতে হবে' প্রবচনটির মত।

তবে, পর্যবেক্ষণের স্বাতন্ত্র্যকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য, অনুসন্ধানের উপজাত হিসাবে অপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ এবং উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। উপাত্ত সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অনন্য উপাদানটি হলো যে, এটি গবেষককে ঘটনা যখন যেভাবে ঘটে, ঠিক তখন সেভাবে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ প্রদান করে। অর্থাৎ, উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত পর্যবেক্ষণ,

পর্যবেক্ষণের স্বাতন্ত্র্যকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য, অনুসন্ধানের উপজাত হিসাবে অপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ এবং উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করা প্রয়োজন।

- ব্যক্তির আচরণ যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয়, সেই প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে;
- যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, সে সকল ঘটনাকে আয়ত্ত করে;
- যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন বা জীবনবোধ অনুযায়ী বাস্তবতা কি তা নির্ধারণ করে; এবং
- একটি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তকে অন্য গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তের সাথে তুলনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সামাজিক জীবনের নৈমিত্তিক ঘটনাবলীকে চিহ্নিত করে।

পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি হলো, অভিজ্ঞতামূলক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন বস্তু, ঘটনা, বা ব্যক্তি যেখানে অধিকাংশ সময় অবস্থান করে, ঘটে, বা অতিবাহিত করে, সেই প্রেক্ষাপট ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের নির্বাচন, উদ্দীপ্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, সাংকেতীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণে, গবেষককে তার পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়কে সম্পাদনা ও সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে নির্বাচন করতে হয়। কারণ, কি বিষয় নির্বাচন করা হবে, কি যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তা করা হবে, কি চলক ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তরদাতাকে উদ্দীপিত করা হবে, কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হবে, কিভাবে করা হবে, উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ, সাংকেতীকরণ ও সংক্ষিপ্তকরণের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং উপাত্ত থেকে কি সিদ্ধান্তমূলক উপসংহার টানা হবে, এর সবকিছুই এই নির্বাচন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি হলো, অভিজ্ঞতামূলক লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন বস্তু, ঘটনা, বা ব্যক্তি যেখানে অধিকাংশ সময় অবস্থান করে, ঘটে, বা অতিবাহিত করে, সেই প্রেক্ষাপট ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের নির্বাচন, উদ্দীপ্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, সাংকেতীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

পর্যবেক্ষণের অনেক রকমফের রয়েছে। এটি একদিকে, যেমন সবচেয়ে পুরোনো একটি পদ্ধতি, অন্যদিকে, এটি একটি সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতিও বটে। এই পদ্ধতিতে নৈমিত্তিক, সাধারণ, আকস্মিক ও অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার পাশাপাশি, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগারের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণও করা হয়। বিভিন্ন রকমের পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। সাধারণভাবে, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – অনিয়ন্ত্রিত সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। অনিয়ন্ত্রিত সাধারণ পর্যবেক্ষণকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় – অংশগ্রহণমূলক ও ন-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনার পর বিভিন্ন ধরণের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Observational Methods)

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসাবে পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, একটি ঘটনা যখন, যেভাবে এবং যেখানে ঘটে, সেই ঘটনা সম্পর্কে ঠিক তখন, সেভাবে এবং সেখানেই তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে যথার্থ উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, যখন গবেষক ও উত্তরদাতার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে মৌখিক, বা লিখিতভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না, তখন পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কারণ, এই পদ্ধতিতে যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাদের তথ্য দেবার ক্ষমতা, বা ইচ্ছা না থাকলেও পর্যবেক্ষক তাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। *তৃতীয়তঃ*, যে সকল উত্তরদাতা, বা উপাত্ত সরবরাহকারী তথ্য সরবরাহ করতে চান না, বা যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে (যেমন, মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ, মাদকাসক্ত ও অপরাধী ব্যক্তি), সে ধরণের উত্তরদাতার কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা সহজতর হয়। কারণ, সে ধরণের পরিস্থিতিতে, গবেষককে তথ্য সরবরাহকারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় না। *চতুর্থতঃ*, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এমন সব বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে, যা তথ্য সংগ্রহের সময় তাৎপর্যপূর্ণ মনে না হলেও সেগুলো পরবর্তীতে ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

তবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। *প্রথমতঃ*, ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, এমন ঘটনার জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা বাস্তবসম্মত হয় না। যেমন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভূমিকম্প, বা অগ্নিসংযোগের মত ঘটনার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ খুব কঠিন হয়ে পড়ে। *দ্বিতীয়তঃ*, যদি পর্যবেক্ষণের দলটি অনেক বড় হয়, বা ঘটনাটি অনেক পরিব্যাপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ঘটনা, বা দলের উপর সর্বাত্মকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি দলটি, বা ঘটনাটি খুব ছোট হয়, সে ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি পক্ষপাতমূলক ও অপ্রতিনিধিত্বশীল উপাত্তের জন্ম দেয়। *তৃতীয়তঃ*, যদি এটি গবেষণাগার পরীক্ষণের মত খুব অনমনীয় একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত না হয়, তবে তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা নির্মাণের জন্য পর্যবেক্ষণ একটি উপযোগী পদ্ধতি হলেও তত্ত্ব থেকে আহরিত অনুকল্প পরীক্ষার জন্য এটি যথাযথ নয়। কখনো কখনো, একই রকম ব্যক্তি, বা ঘটনার জন্য উপসংহারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হলেও সে সকল উপসংহার কেবলমাত্র তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা যায়, তত্ত্ব পরীক্ষার জন্য নয়।

অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Uncontrolled Participant Observation)

সামাজিক সম্পর্কের উপর মানুষের অধিকাংশ জ্ঞানই অর্জিত হয় সাধারণতঃ অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এই অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ অংশগ্রহণমূলক (participant), বা ন-অংশগ্রহণমূলক (non-participant) উভয়ই হতে পারে। এ ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণ বলতে পর্যবেক্ষণমূলক কৌশলের পরিমিতকরণ, বা কোন কোন ক্ষেত্রে, একটি পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে, চলকসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা সেই পরিস্থিতি থেকে সামাজিক আচরণ সম্পর্কে জানতে পারি, যে পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলো দেখি, বা যে পরিস্থিতিতে আমরা নিজেরা অংশগ্রহণ করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের

পর্যবেক্ষণগুলো অন্য কোন পর্যবেক্ষক, বা কোন নির্ধারিত দফা, বা কোন পরীক্ষণের রীতি পদ্ধতি দ্বারা পুনঃপরীক্ষিত হয় না।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হলো, যাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, তাদের সামাজিক পরিবেশে, তাদের সাথে গবেষকের একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিবিড় সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি।

ঐতিহাসিকভাবে, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের কাছে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পদ্ধতিতে, যাদের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়, তাদের সাথে গবেষক একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মাঝে অবস্থান করেন। ব্যক্তি যে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশে বাস করেন, সেই পরিবেশে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ও আচরণকে বোঝার উদ্দেশ্যে গবেষক প্রতিদিনের কর্মকান্ডে তাদের আচরণকে পর্যবেক্ষণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। অর্থাৎ, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ হলো, যাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, তাদের সামাজিক পরিবেশে, তাদের সাথে গবেষকের একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিবিড় সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি।

এ পদ্ধতিতে, পর্যবেক্ষকের ভূমিকাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে না দিয়ে পর্যবেক্ষক যে গোষ্ঠী, বা দলকে পর্যবেক্ষণ করবেন, সেই দলে তিনি একজন পূর্ণ সদস্যে পরিণত হতে চেষ্টা করেন। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে, যাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, গবেষক তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে গবেষককে তাদের ভাষা, সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস, আচরণ, আকার, ইঙ্গিত, ইত্যাদি শিখতে হয়। গবেষককে সেই সামাজিক পরিবেশে একটি ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, যেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি সেই সমাজে নিজেকে একজন গ্রহণযোগ্য সদস্যে পরিণত করেন। উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষককে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন, কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া, ইত্যাদি। গবেষক সচরাচর অংশগ্রহণকারী সদস্যদের আগোচরে, পর্যবেক্ষণের পর পরই তা লগ বই, ডায়েরী, বা টোকা বইয়ে লিখে ফেলেন, বা কোন যন্ত্র ব্যবহার করে সেগুলোকে রেকর্ড করেন।

উপরের আলোচনায়, দেখা যাচ্ছে যে, যখন পর্যবেক্ষক, বা গবেষক নিজেই পর্যবেক্ষণকৃত দলের সদস্য হিসাবে পরিগণিত হন, তখন সেটা হয় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ। তবে, দলের অন্যান্য সদস্যদের মতো গবেষককে যে একই কাজ করতে হবে, তা নয়। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক হবার জন্য তিনি ঐ দলে গ্রহণযোগ্য যে কোন ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে সাধারণতঃ, তার আসল উদ্দেশ্যটি গোপন থাকে। অর্থাৎ, তিনি এমন একটি ভূমিকা পালন করেন, যাতে করে দলের স্বাভাবিক কার্যক্রম বা আচরণে ব্যাঘাত না ঘটে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষক দলের পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন যে কোন রকমের সদস্য হতে পারেন।

অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Uncontrolled Participant Observation)

অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের একটি বড় সুবিধা হলো যে, যদি দলের সদস্যরা গবেষকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকেন, তবে গবেষকের অংশগ্রহণের ফলে তাদের আচরণ বা কার্যক্রম প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। ফলে, গবেষকের পক্ষে দলের স্বাভাবিক কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করা সহজ হয়। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষকের অনুভূতি বা আবেগ পর্যবেক্ষণকৃত দলের সত্যিকার সদস্যদের মতো হতে পারে। সে ক্ষেত্রে, পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণকৃত দলের অনেক গভীরতর তথ্য পেতে পারেন, যা শুধুমাত্র সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। এভাবেই, তাদের প্রকৃত আচরণ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে গবেষক ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যেহেতু তার অংশগ্রহণের সময়কাল দীর্ঘ সময়ের জন্য হয়, সেহেতু এ সময়ে তার সংগৃহীত তথ্যাদি অনেক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার জরিপ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যাদি অপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক হয়। কোন সদস্য কোন প্রেক্ষাপটে কোন মতামত দিচ্ছেন, তা লিপিবদ্ধ করাও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব। ফলে, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ সাধারণ প্রশ্নমালা জরিপের চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও রয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে সেগুলো পর্যলোচনা করা প্রয়োজন। গবেষক পর্যবেক্ষণকৃত দলের একজন প্রকৃত সদস্য হয়ে যাবার ফলে, তিনি তার অভিজ্ঞতার সীমা সংকীর্ণ করে ফেলেন। তিনি যে দলে অংশগ্রহণ করেন, সেখানে তার কিছু বন্ধু গড়ে উঠে। ফলে পর্যবেক্ষণের সময় তিনি সে সকল বন্ধু বা বিশেষ উপ-দলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকেন। দলের প্রধান আচরণ বা কার্যক্রম অনুসরণ করা গবেষকের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে বলে, অনেক সময় দলের প্রান্তিক সদস্যরা তার পর্যবেক্ষণের বাইরে থেকে যান। পর্যবেক্ষক অনেক সময় এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন যে, তার প্রভাবে দলের প্রকৃত আচরণ বদলে যেতে পারে। একইভাবে, পর্যবেক্ষণকৃত দলের সাথে আবেগাপ ুত হয়ে সম্পৃক্ত হবার ফলে, তিনি তার বস্তুনিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলতে পারেন। গবেষক দলের সদস্য হতে গিয়ে দলের মধ্যে নিজের সম্মান ও আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে গবেষক ব্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। দলের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোন দুঃখজনক ঘটনায় সহানুভূতিশীল হতে গিয়ে তিনি তার সাথে ঘনিষ্ট সদস্যদের উপর সেই ঘটনার প্রভাবকে পক্ষপাতমূলকভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। সর্বোপরি, গবেষক যেহেতু পর্যবেক্ষণকৃত দলের প্রকৃত আচরণটি আয়ত্ব করেন, সেহেতু সেগুলোকে তিনি প্রাকৃতিক এবং সঠিক বলে ধরে নেন। গবেষক যে পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ করেন, সেখানে তার অর্জিত অভিজ্ঞতা তার নিজস্ব। দ্বিতীয় কোন গবেষক একই ঘটনা একইভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না বলে উপাত্তের প্রমিতকরণ সম্ভব হয় না। সুতরাং, এক কথায় বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে পর্যবেক্ষক হিসাবে গবেষকের ভুমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

ন-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Non-Participant Observation)

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যার অনেকগুলোরই সমাধান দিতে পারে ন-অংশগ্রহণমুলক পর্যবেক্ষণ। তবে, প্রকৃত ন-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ আসলেই একটি কঠিন কাজ। একজন পর্যবেক্ষক, যিনি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু কখনোই অংশগ্রহণকারী হন না, তার জন্য দলের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক, বা ভূমিকার রূপ নির্ধারণ করা থাকে না। সুতরাং, পর্যবেক্ষণকৃত দল এবং পর্যবেক্ষণকারী উভয়ই অস্বস্তি বোধ করতে পারেন এবং স্বাভাবিকভাবেই, অনেকের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে, একজন বাইরের লোকের পক্ষে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, অপরাধী দলের উপর গবেষণার জন্য একজন সমাজবিজ্ঞানী অপরাধী হয়ে যেতে পারেন না, বা কোন কিশোর অপরাধীর দলে, বা কোন পুলিশ স্কোয়াড, কিংবা এ রকম কোন দলের সদস্য হয়ে যেতে পারেন না।

ন-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ প্রকৃতপক্ষে, একটি আধা-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

অন্যদিকে, গবেষককে কোন দলে যে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে, এমন কোন কথা নেই। একেবারেই অংশগ্রহণ না করার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য, গবেষক একটি দলের কোন কোন কাজে অংশ নিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি হতে পারেন পর্যবেক্ষক, আবার কোথাও হতে পারেন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী। এটিই সামাজিক গবেষণার একটি ধ্রুপদী রূপ। ন-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ প্রকৃতপক্ষে, একটি আধা-অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। নিজেকে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশে রাখার চেয়ে বরং গবেষকের পক্ষে দুরকম ভূমিকা পালন করা অধিকতর সহজ। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ের পরিচিতি ও ব্যাখ্যার পর পর্যবেক্ষণকৃত সম্প্রদায়, বা দলের সদস্যরা মাঠ কমীর উপস্থিতিকে তাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নেন। তিনি পরিস্থিতির সাথে আবেগ তাড়িতভাবে জড়িত হন না বলে দলের সদস্যরা তাদের অনেক জটিল বিষয় ও সমস্যা নিয়ে গবেষকের সাথে সহজেই আলাপ করতে পারেন, যা তারা তাদের আপনজনদের সাথেও হয়তো আলোচনা করবেন না।

নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ (Controlled Observation)

অনুসন্ধানমূলক গবেষণার জন্য সাধারণ পর্যবেক্ষণই সবচেয়ে বেশী উপযোগী। কিন্তু গবেষক ক্রমেই বুঝতে পারেন যে, সতর্কতার সাথে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার অনুসূচী, পরীক্ষণ, বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সংগৃহীত টোকাগুলোর ঘাটতি পূরণ করার

প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, শারীরিক গঠনের আনুমানিক ধারণার পরিবর্তে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, বা কোন এলাকার দূরত্ব সম্পর্কে অনুমিত ধারণাকে প্রকৃত ম্যাপ-এর মাধ্যমে শুধরে নেয়ার প্রয়োজন হয়। কারণ, আমাদের ধারণাগুলো যত বেশী গভীর ও তীক্ষ্ম হবে, আমরা তখন অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের উপর তত কম নির্ভর করবো। এভাবে, গবেষণা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আমরা নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণের কথা ভাবতে পারি। এ ক্ষেত্রে, একটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, একটি সূচি, বা মানচিত্র অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের উপর নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের মত নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণেও গবেষক পর্যবেক্ষণকৃত ব্যক্তির কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করেন না। বরং তিনি পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়াকে প্রণালীবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। আমরা জানি যে, পর্যবেক্ষক কোন না কোনভাবে পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে, গবেষক যা করতে পারেন, তা হলো এই প্রভাবকে যতটুকু সম্ভব কমাতে পারেন, বা কমপক্ষে এই প্রভাবকে পরিমাপ করতে পারেন। অতএব, পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতিটি কি প্রাকৃতিক হবে, না কি কৃত্রিম হবে এবং যাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, তারা কি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জানবেন, কি জানবেন না, সে সকল বিষয়ে গবেষককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কখন, কিভাবে এবং কোন অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করেছেন, এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করে একজন সমাজবিজ্ঞানী তার উপাত্তের সীমাবদ্ধতা ও পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি অন্যান্য গবেষককে অবহিত করতে পারেন।

অধিকাংশ অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণে, পরিবেশটি প্রাকৃতিক থাকে এবং যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, তারা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকেন না। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণকে প্রাকৃতিক পরিবেশেও পরিচালিত করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরণের নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণে, পর্যবেক্ষণকৃত ব্যক্তিরা জানেন যে, তাদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণকৃত ব্যক্তিদের পরিবেশকে প্রাকৃতিক হিসাবে অনুভব করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ পক্ষপাতকে আংশিকভাবে সীমিত করে থাকে। কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণটি ঘটে থাকে পর্যবেক্ষণকৃত ব্যক্তিদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, সেগুলো হলো, যুগপৎভাবে যান্ত্রিক কৌশল, দলীয় পর্যবেক্ষণ, অনুসূচীর ব্যবহার এবং পর্যবেক্ষণকৃত আচরণকে দ্রুত সাংকেতীকরণের মাধ্যমে বিস্তারিত শ্রেণীবদ্ধকৃত দফার নির্মাণ। এভাবে, ধীরে ধীরে গবেষক একটি পরিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ পরিবেশ থেকে গবেষণাগার নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের দিকে উত্তোরণ ঘটান। সে ক্ষেত্রে, পরিবেশটি হয় একটি কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, যেখানে সুনির্দিষ্ট উদ্দীপক ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকে যতটুকু সম্ভব প্রমিতকরণ করা হয়।

সারাংশ

সামাজিক গবেষণায়, পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে, প্রথমেই গবেষককে মূল নীতিমালার আলোকে স্থান এবং সময় ভেদে গবেষণার ধাপগুলি ঠিক করে নিতে হয়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় — অনিয়ন্ত্রিত সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির আচরণ, সমাজে সংঘঠিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী, ইত্যাদিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ, গবেষণার ধরণের উপর নির্ভর করে পর্যবেক্ষণের ধাপগুলিকে নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান পাঠে, পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব, এর সুবিধা ও অসুবিধা, ধরণ, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। সাধারণভাবে, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিকে:

ক. দু'ভাগে ভাগ করা যায়
খ. তিন ভাগে ভাগ করা যায়
গ. চার ভাগে ভাগ করা যায়
ঘ. যতভাবে ইচ্ছা ততভাবে ভাগ করা যায়।

২। পর্যবেক্ষণে উপাত্তের প্রমিতকরণ করা সম্ভব হয় না, কারণ:

ক. নমুনার সংখ্যা কম থাকে
খ. পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অর্জনে সময় বেশী লাগে
গ. একই ঘটনা একইভাব উপলব্ধি করা যায় না বলে
ঘ. একই ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না বলে।

৩। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক আচরণের কতটুকু পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ, তা নির্ভর করে:

ক. পর্যবেক্ষণ স্থানের উপর
খ. পর্যবেক্ষণের যত্নশীলতার উপর
গ. পর্যবেক্ষণের সময়ের উপর
ঘ. পর্যবেক্ষণের পরিবেশের উপর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি কী?

২। নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা পরিচালনায় পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা
Self-Administered Mailed Qestionnaire

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা কী
- ডাক প্রশ্নমালায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ
- ডাক প্রশ্নমালার সুবিধা ও অসুবিধা

স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা কী (What is Self-Administered Mailed Questionnaire)?

গবেষক যে সব বিষয় ও ঘটনাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারেন, সে সব বিষয় ও ঘটনাকে নিয়ে গবেষণার জন্য পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি হলো সবচেয়ে উপযুক্ত। তবে, সমাজের সব বিষয় ও ঘটনা গবেষক প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, গবেষক কোন প্রপঞ্চ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, এ বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তথ্য পেতে পারেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমটি হতে পারে মৌখিক বা লিখিত। মৌখিকভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তথ্য সংহগ্রের জন্য সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং লিখিতভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছে স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয়। গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি, এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এবং জনবলের সহজলভ্যতার কথা মাথায় রেখেই গবেষক এ দু'টি পদ্ধতির মধ্যে এমন একটি নির্বাচন করেন, যার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন নির্বাচিত নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

যখন একই সাথে অনেক বেশী সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও দ্রুততার সাথে কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রেরণের প্রয়োজন হয়, তখন স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালার মাধ্যমে পরিচালিত জরিপ একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালায় একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে অধিকাংশ প্রশ্নকে আগে থেকেই সাংকেতীকরণ করে নিতে হয় এবং গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই উত্তরদাতা প্রতিটি প্রশ্নে প্রদত্ত একাধিক উত্তর-দফা থেকে তার পছন্দের উত্তরটি বেছে নেন। স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালায় প্রশ্নগুলো এমনভাবে বর্ণিত থাকে, যাতে করে উত্তরদাতা সেগুলো সহজেই বুঝতে পারেন এবং যথাযথ উত্তরটি বেছে নিতে পারেন।

স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালায় প্রশ্নগুলো এমনভাবে বর্ণিত থাকে, যাতে করে উত্তরদাতা সেগুলো সহজেই বুঝতে পারেন এবং যথাযথ উত্তরটি বেছে নিতে পারেন।

স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালার প্রধান সুবিধাটি হলো যে, এর মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে একটি বড় সংখ্যক নমুনা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। কারণ, এখানে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রয়োজন হয় না এবং পূর্ব-সাংকেতীকরণ পদ্ধতি ও কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে ও দ্রুততার সাথে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যায়। উত্তরদাতারাও তাদের সুবিধাজনক সময়ে প্রশ্নমালা পূরণ করতে পারেন। স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা উপাত্ত সংগ্রহের একটি নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি বলে, এটি অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ হয়ে থাকে। ডাক প্রশ্নমালার প্রধান অসুবিধাটি হলো যে, এতে উত্তর ফেরৎ প্রাপ্তির হার কম হয়ে থাকে। অনেক ডাক জরিপেই দেখা যায় যে, যত প্রশ্নমালা ডাকে পাঠানো হয়েছে, তার মাত্র ২০ থেকে ৫০ শতাংশ ফেরৎ এসেছে। তবে, এই উত্তর প্রাপ্তির হার ও উপাত্তের মান অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের গুণগত মান ও বৈশিষ্ট্য, প্রশ্নমালাটি সম্পর্কে উত্তরদাতার দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশ্নমালা পূরণের সহজসাধ্যতা, ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

ডাক প্রশ্নমালার প্রধান অসুবিধাটি হলো যে, এতে উত্তর ফেরৎ প্রাপ্তির হার কম হয়ে থাকে।

ডাক প্রশ্নমালায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ (Factors Affecting Mailed Questionnaire)

সিদ্ধান্তকে যে সকল উপাদান প্রভাবিত করে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোক্তার পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা, বৈধতা, ক্ষমতা ও মর্যাদা।

গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোক্তা (Sponsorship): উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্তকে যে সকল উপাদান প্রভাবিত করে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোক্তার পরিচিতি, গ্রহণযোগ্যতা, বৈধতা, ক্ষমতা ও মর্যাদা। কারণ, উত্তরদাতা নিশ্চিত হতে চান যে, গবেষণায় তার অংশগ্রহণ যেন কোনভাবেই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বা খ্যাতিবান বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত ডাক প্রশ্নমালার উত্তরপ্রাপ্তির হার সাধারণতঃ উচ্চ হয়ে থাকে। কারণ, এ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ের বৈধতা নিয়ে উত্তরদাতার মনে তেমন কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠানের অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য থাকে বলে উত্তরদাতার কাছে মনে হয়, সে সকল ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হারে উত্তরপ্রাপ্তি বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময়, উত্তরদাতা কোনভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে বাঁধা থাকলে, বা গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে, সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য হন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধমূলক সম্পর্ক থাকলে, সে ক্ষেত্রে উত্তর প্রাপ্তির হার নাটকীয়ভাবে কম হবে।

উত্তরদাতা পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা বেশী পছন্দ করেন।

প্রশ্নমালার আঙ্গিক (Questionnaire Format): অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, টাইপ করে ফটোকপি করা প্রশ্নমালার তুলনায় ছাপানো প্রশ্নমালায় উত্তরপ্রাপ্তির হার বেশী হয়ে থাকে। ভিন্ন পাতায় ছাপানো প্রশ্নমালার তুলনায় প্রচ্ছদ পত্রের অপর পৃষ্ঠায় ছাপানো প্রশ্নমালায় উত্তরপ্রাপ্তির হার বেশী পাওয়া যায়। এর অর্থ হলো যে, উত্তরদাতা পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা বেশী পছন্দ করেন। রঙ্গিন কাগজে ছাপানো প্রশ্নমালা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা উচ্চ হারে উত্তরপ্রাপ্তি ঘটালেও তা খুব বেশী তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তবে এটি বলা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাগজ ব্যবহার করলে প্রশ্নমালা কিছুটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

সাধারণ নিয়ম হিসাবে, একটি প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিৎ, যাতে করে তা পূরণ করতে উত্তরদাতার আধা ঘন্টার বেশী সময় না লাগে।

প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য (Questionnaire Length): প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য কত বড় হবে, তা নির্ভর করে গবেষণার উদ্দেশ্য, চলক ও সূচকের সংখ্যা, প্রশ্নের সংখ্যা, গবেষণা পদ্ধতি, বিশ্লেষণের কৌশল এবং সম্পদের সহজলভ্যতার উপর। একটি প্রশ্নমালায়, প্রশ্নের সংখ্যা কয়েকটি থেকে কয়েক শত হতে পারে। গবেষকদের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য ছোট রাখতে গিয়ে খুব ঘিঞ্জি করে ফেললে, তা উত্তরদাতার আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। প্রশ্নমালার আকার খুব বেশী দীর্ঘ হলেও তা পূরণ করে ফেরৎ পাঠানোর মত সময় উত্তরদাতা ব্যয় করতে চান না। সাধারণ নিয়ম হিসাবে, একটি প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিৎ, যাতে করে তা পূরণ করতে উত্তরদাতার আধা ঘন্টার বেশী সময় না লাগে।

দীর্ঘ যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করা একটি পত্রের তুলনায় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য পত্রের মাধ্যমে উত্তরপ্রাপ্তির হার বেশী হয়ে থাকে।

প্রচ্ছদ পত্র (Cover Letter): কার্যতঃ, প্রতিটি প্রশ্নমালার সাথেই গবেষণার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচ্ছদ পত্র সংযোজিত থাকে। প্রচ্ছদ পত্রের দৈর্ঘ্য, আহ্বানের প্রকৃতি, বা সেটি আলাদা পাতায় লেখা হবে, না কি প্রশ্নমালার সাথেই লেখা হবে, এ সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রচ্ছদ পত্র বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। প্রচ্ছদ পত্র কি ব্যক্তির নামে হবে, না কি নাম ছাড়া একটি সাধারণ পত্রই যথেষ্ট হবে, এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ মনে করেন যে, গবেষকের স্বাক্ষরে উত্তরদাতার নামে প্রচ্ছদ পত্র পাঠালে উত্তরদাতার কাছে তার আবেদন কিছুটা ভিন্ন হয় এবং উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠানোর তাগিদ অনুভব করেন। অন্যেরা মনে করেন যে, পত্রটি কিভাবে লেখা হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ। সেটি কি উত্তরদাতার নামে হলো, না কি গবেষকের স্বাক্ষরে হলো, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি কড়া ও দৃঢ় ভাষায় লেখা পত্রের তুলনায় একটি অনুমোদনমূলক পত্র অধিকতর উচ্চ মাত্রায় উত্তরপ্রাপ্তি ঘটায়। দীর্ঘ যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করা একটি পত্রের তুলনায় একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য পত্রের মাধ্যমে উত্তরপ্রাপ্তির হার বেশী হয়ে থাকে।

প্রশ্নমালা পূরণে সহজসাধ্যতা (Ease of Completing the Questinnoire): আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ডাক প্রশ্নমালার মাধ্যমে নির্ভুল ও বেশী পরিমাণে উত্তর পেতে হলে, প্রশ্নমালাকে

ডাক প্রশ্নমালার মা
ও বেশী পরিমাণে উ
হলে, প্রশ্নমালাকে
হতে হবে, যাতে ক
উত্তরদাতা স্বাচ্ছন্দে
পূরণ করতে পারেন

সহজবোধ্য হতে হবে, যাতে করে উত্তরদাতা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে তা পূরণ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নির্দেশাবলীকে খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রশ্নমালার মধ্যে যথাযথ নির্দেশাবলী থাকে না এবং থাকলেও তা অপর্যাপ্ত থাকে। উত্তর-দফাগুলোকে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। খুব বেশী উন্মুক্ত প্রশ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এ সব বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান না হলে, উত্তরদানের নিম্ন হারসহ ভ্রান্তিযুক্ত উত্তর আসতে পারে।

উত্তরদানে উদ্বুদ্ধকরণ (Inducements to Reply): প্রশ্নমালাটি যদি উত্তরদাতাকে আকৃষ্ট না করে, বা উত্তরদানে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ না করে, তবে তিনি তা পূরণে আগ্রহ পাবেন না। সে লক্ষ্যে, গবেষণার গুরুত্বসহ ফলাফলের মান বৃদ্ধির জন্য উত্তরদাতার সহযোগিতার বিষয়টি যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা প্রচ্ছদ পত্রে দক্ষতার সাথে তুলে ধরতে হবে। উত্তরদাতার সাহায্য ছাড়া যে গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না, তাও উত্তরদাতাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রশ্নমালা পূরণ করার জন্য নির্বাচিত করা হয় নি, তার জন্য বিজ্ঞানসম্মত নমুনায়ন পদ্ধতিতে তার নির্বাচিত হওয়ার কথাটি জানাতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যদি কোন সম্মানী দেবার ব্যবস্থা থাকে, তবে তাও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে হবে। অনেক সময়, এ সকল ছোটখাট বিষয়ও উত্তরপ্রাপ্তির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

গবেষণার গুরুত্বসহ ফলাফলের মান বৃদ্ধির জন্য উত্তরদাতার সহযোগিতার বিষয়টি যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা প্রচ্ছদ পত্রে দক্ষতার সাথে তুলে ধরতে হবে।

উত্তরদাতার প্রকৃতি (Nature of the Respondents): যেহেতু গবেষকদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, ডাক প্রশ্নমালায় উত্তরদানের হার সাধারণভাবেই কম হয়ে থাকে, সেহেতু বলা যায় যে, সর্বস্তরের উত্তরদাতার ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োজ্য। শুধুমাত্র অল্প শিক্ষিত, বা কম শিক্ষিতদের ক্ষেত্রেই নয়, নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের (যেমন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, ইত্যাদি) ক্ষেত্রেও প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠানোর হার নিম্ন হয়ে থাকে। তবে, একটি অসম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নমুনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সবচেয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরা সবচেয়ে দ্রুত প্রশ্নমালা ফেরৎ পাঠান এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর প্রতি যারা সবচেয়ে বেশী উদাসীন, তারা সবচেয়ে কম ফেরৎ পাঠান। প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠানোর বিষয়টি দ্বিমাত্রিক — যারা বিষয়ের পক্ষে, তারা বেশী উত্তর পাঠান এবং যারা উদাসীন, তারা কম উত্তর পাঠান। অতএব, উত্তরদাতা যাতে উদাসীন না হন, গবেষককে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠানোর বিষয়টি দ্বিমাত্রিক — যারা বিষয়ের পক্ষে, তারা বেশী উত্তর পাঠান এবং যারা উদাসীন, তারা কম উত্তর পাঠান।

প্রশ্নমালা প্রেরণের সময় (Timing of Mailing Questionnaire): প্রশ্নমালাটি কোন সময়ে উত্তরদাতার কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে, উত্তরপ্রাপ্তির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোন গবেষকই চাইবেন না যে, লম্বা ছুটির ঠিক আগে, বা সন্তানের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে, বা ধর্মীয় উৎসবকালীন ছুটির প্রাক্কালে প্রশ্নমালাটি উত্তরদাতার কাছে পৌঁছুক। কারণ, এ সময়ে উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে, তিনি হয়তো সেটি এক পলক দেখে এক পাশে সরিয়ে রাখবেন, বা ফেলে দেবেন।

প্রশ্নমালাটি কোন সময়ে উত্তরদাতার কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে, উত্তরপ্রাপ্তির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসরণ ও স্মরণ করিয়ে দেয়া (Follow-up and Reminders): অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি বিষয়ে গবেষকরা একমত হয়েছেন যে, প্রশ্নমালা ডাকে প্রেরণের পর যদি উত্তরদাতাকে অনুসরণ করা হয়, বা স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়, তবে উত্তর প্রাপ্তির মাত্রা বেড়ে যায় প্রায় ২০ শতাংশ। তবে, এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসরণ ও স্মরণ করিয়ে দেয়া উত্তরদাতার জন্য বিরক্তিকর হতে পারে এবং তা হিতে বিপরীত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে, গবেষকের উচিৎ যে, তিনি প্রশ্নমালা ফেরৎ আসা বন্ধ হবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং তারপর স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য একটি পত্র দিয়ে অনুসরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে, স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য প্রেরিত পত্রের মধ্যে কি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে, তাও গুরুত্বপুর্ণ। এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্মরণ করিয়ে দেবার পত্রটি যেন উত্তরদাতার কাছে হুমকিস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়।

প্রশ্নমালা ডাকে প্রেরণের পর যদি উত্তরদাতাকে অনুসরণ করা হয়, বা স্মরণ করিয়ে দেয়া যায়, তবে উত্তর প্রাপ্তির মাত্রা বেড়ে যায় প্রায় ২০ শতাংশ।

প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠান না, এমন উত্তরদাতাদের চারটি দলে বিভক্ত করা যেতে পারে। একদল উত্তরদাতা রয়েছেন, যারা হয় ডাক অফিসের ভুলের কারণে, নতুবা ভুল ঠিকানার কারণে

প্রশ্নমালা পান না বলে উত্তর দেন না। এই দলে, সে সকল উত্তরদাতাও রয়েছেন, যারা হয়তো প্রশ্নমালা পূরণ করে পাঠান, কিন্তু সেটি পথে কোথাও হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় দলে, এমন সব উত্তরদাতা রয়েছেন, যারা হয় শারীরিক অক্ষমতা, বা অসুস্থতার কারণে, নতুবা ভাষা না বোঝার কারণে, নতুবা লেখাপড়া না জানার কারণে, নতুবা প্রযোজ্য নয়, এমন ব্যক্তি হবার কারণে, প্রশ্নমালা পূরণ করতে পারেন না। তৃতীয় দলে রয়েছেন, যারা অহেতুক কালক্ষেপণ করেন, নতুবা ভুলে যান, নতুবা কোথাও ভুল করে রেখে খুঁজে পান না এমন ব্যক্তি। চতুর্থ দলে রয়েছেন, যারা কোনক্রমেই প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠান না। এদের কেউ মনে করেন যে, জরিপ গবেষণা অর্থহীন, অনেকে তাদের উন্নাসিকতার কারণে প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠান না, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয়, বা সরকারের প্রতি তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের কারণে তা করেন না। স্মরণ করিয়ে দেবার পত্রটি দ্বিতীয় দলের জন্য কোনভাবেই কার্যকর হবে না। চতুর্থ দলটি হলো সবচেয়ে কঠিন দল, যারা জরিপের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। কোন আবেদনই তাদের মন গলাতে পারবে না। প্রথম ও তৃতীয় দলটি হলো স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য উপযুক্ত দল।

ডাক প্রশ্নমালার সুবিধা (Advantages of Mailed Questionnaire)

স্বল্প ব্যয় (Low Cost): স্বল্প ব্যয় হলো ডাক প্রশ্নমালা ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা। ডাক প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন। যখন গবেষণা নমুনা একটি বড় ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে, তখন স্বল্প ব্যয়ের সুবিধাটি ডাক প্রশ্নমালা ব্যবহারে সবচেয়ে বেশী প্রতিভাত হয়।

সময় সাশ্রয় (Time Savings): ডাক প্রশ্নমালা একই সময়ে সকল উত্তরদাতার কাছে প্রেরণ করা সম্ভব হয় এবং পূরণকৃত প্রশ্নমালা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফেরৎ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে চলে বলে, তা সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

পক্ষপাতজনিত ভ্রান্তি হ্রাস (Reduction in Biasing Error): সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, কিংবা তাদের দক্ষতার পার্থক্যের কারণে, যে পক্ষপাতজনিত ভ্রান্তি তৈরি হয়, ডাক প্রশ্নমালা ব্যবহারে সেই ভ্রান্তিগুলো ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী বিভিন্নভাবে উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারেন। যেমন, প্রোৎসাহিত করার সময় কণ্ঠের অবকুঞ্চন, উত্তরদাতার কাছে নির্দিষ্ট ধরণের উত্তর প্রত্যাশার অনুমান, বা উত্তরদাতাকে নিজের মতামত প্রদান, ভুলভাবে প্রশ্ন করা, উত্তর লিপিবদ্ধকরণে সমস্যা, ইত্যাদি। ডাক প্রশ্নমালা ব্যবহারে এই ভ্রান্তিগুলো হবার সুযোগ থাকে না।

নামহীনতা (Anonymity): তথ্য সংগ্রহের সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর অনুপস্থিতির কারণে উত্তরদাতা নির্বিঘ্নে এমন উত্তর প্রদান করেন, যা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপস্থিতিতে উত্তরদাতা কোনভাবেই দেবেন না। যখন কোন স্পর্শকাতর বিষয় গবেষণার বিষয়বস্তু হয় (যেমন, যৌন আচরণ বা শিশু অত্যাচার), তখন এই নামহীতার কারণে উত্তরদাতা এ রকম স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

চিন্তাভাবনামূলক উত্তর এবং আলোচনার সুযোগ (Opportunity for Considered Answers and Consultation): যখন কোন প্রশ্নের জন্য একটু চিন্তা ভাবনা বা বিবেচনা করে জবাব দিতে হয়, অথবা উত্তরদাতাকে অন্য কারো সাথে আলোচনা করে প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, তখন ডাক প্রশ্নমালা উপাত্ত সংগ্রহের একটি অধিকতর উপযোগী হাতিয়ার হয়ে উঠে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে এই সুবিধাটি থাকে না। কারণ, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উত্তরদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর প্রদানে বাধ্য থাকেন।

প্রমিত শব্দায়ন (Standardized Wording): যেহেতু উত্তরদাতা নিজেই প্রশ্নমালা পড়ে উত্তর দেন এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না, সেহেতু সব উত্তরদাতার কাছেই প্রশ্নগুলো

একইভাবে উপস্থাপিত হয়। পাশাপাশি, উত্তর-দফাগুলো উত্তরদাতা নিজেই চিহ্নিত করেন বলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কোন পক্ষপাতমূলক ভ্রান্তি এখানে প্রবেশ করে না। অতএব, ডাক প্রশ্নমালার ব্যবহার সাক্ষাৎকারের তুলনায় অনেক বেশী প্রমিতকরণের সুযোগ প্রদান করে।

সহজগম্যতা (Accessibility): ডাক প্রশ্নমালা স্বল্প ব্যয়ে ব্যাপক বিস্তৃত এলাকায় গবেষণা সম্পাদনের সুযোগ প্রদান করে। যখন ব্যাপক ভৌগলিক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত নমুনার কাছে পৌঁছতে হয়, তখন সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনেক ব্যয়বহুল এবং একইসঙ্গে সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণভাবে পৌঁছানো যায় না, এমন উত্তরদাতার কাছে সহজেই শুধুমাত্র ডাকমাশুল প্রদান করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রশ্নমালা পৌঁছে দেয়া যায়।

ডাক প্রশ্নমালার অসুবিধা (Disadvantages of Mailed Questionnaire)

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উত্তর প্রদানের হার যেখানে ৯৫ শতাংশ হয়, সেখানে ডাক জরিপে উত্তর প্রাপ্তির হার ২০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে থাকে।

উত্তর প্রদানের নিম্নহার (Low Response Rate): ডাক প্রশ্নমালার সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক অসুবিধাটি হলো যে, এতে পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তর পাওয়া খুব কঠিন। উত্তর প্রদানের হার বলতে, কত শতাংশ উত্তরদাতা প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন, তার মাত্রাকে বোঝানো হয়ে থাকে। অনেক ডাক জরিপে, ফেরৎপ্রাপ্ত উত্তরের হার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরের হারের চেয়ে অনেক কম হয়ে থাকে। সাধারণতঃ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উত্তর প্রদানের হার যেখানে ৯৫ শতাংশ হয়, সেখানে ডাক জরিপে উত্তর প্রাপ্তির হার ২০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে থাকে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উত্তর না দেবার কারণগুলো জানা যায়, কিন্তু ডাক প্রশ্নমালায় সেগুলো জানা যায় না। ডাক প্রশ্নমালায় উত্তর না দেয়ার প্রভাব গবেষণার ফলাফলে কি পরিমাণ পড়বে, গবেষক তা পরিমাপ করতে পারেন না।

নমনীয়তার অভাব (Lack of Flexibility): ডাক প্রশ্নমালার মধ্যে প্রশ্ন এবং উত্তর-দফা যেভাবে দেয়া থাকে, উত্তরদাতাকে সেগুলো থেকে সেভাবেই উত্তর দিতে হয়। এর ফলে, প্রমিতির মাত্রা বৃদ্ধি পেলেও নমনীয়তার মাত্রা কমে যায়। ডাক প্রশ্নমালায়, প্রশ্নকে গভীরভাবে অনুধাবন করা, বা ভিন্ন উত্তর-দফা নির্বাচনের কোন সুযোগ থাকে না। উত্তরদাতার জন্য প্রশ্নকে গভীরভাবে অনুধাবন করা, বা ভিন্ন উত্তর-দফা নির্বাচনের কোন সুযোগ থাকে না। ফলে, উত্তরদাতা যদি প্রশ্নকে ভুল বোঝেন, তবে তিনি ভুল উত্তর দিবেন এবং যদি বুঝতে না পারেন, তবে অস্পষ্ট ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দিবেন।

সহজ প্রশ্নাবলীর প্রয়োজন (Needs Easy Questions): যখন প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলো খুব সহজ, সরাসরি এবং প্রশ্নগুলো বোঝার জন্য প্রশ্নমালায় প্রদত্ত নির্দেশনাগুলো যথাযথ হয়, তখনই ডাক প্রশ্নমালা তথ্য সংগ্রহের একটি কৌশল হিসাবে প্রত্যাশিত ফলাফল প্রদান করবে। প্রশ্নমালায় জটিল সাপেক্ষ প্রশ্নের আঙ্গিক ব্যবহার একজন সাধারণ উত্তরদাতার জন্য বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। জটিল প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে অধিকতর উন্নত ফল দেয়। কারণ, সেটি পূরণ করার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু ডাক প্রশ্নমালায়, উত্তরদাতার সে ধরণের কোন প্রশিক্ষণ থাকে না।

কেবলমাত্র মৌখিক আচরণ (Verbal Behaviour Only): ডাক প্রশ্নমালায়, উত্তরদাতা যে উত্তর লিখবেন, সেটিকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপস্থিতি থাকে না বলে এখানে অস্পষ্ট কোন উত্তরকে আরো পরিস্কার করে জানা, বা প্রোৎসাহিত করার কোন সুযোগ গবেষকের থাকে না। উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়াগত আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। উত্তরদাতার অমৌখিক আচরণের পর্যবেক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একজন উত্তরদাতা তার নিজস্ব সামাজিক অবস্থানসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে লুকিয়ে এমন উত্তর প্রদান করতে পারেন, যা ফলাফলের প্রতিনিধিত্বশীলতাকে খর্ব করতে পারে।

উত্তরদাতার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণহীণতা (No Control over Respondents' Environment): ডাক প্রশ্নমালায়, উত্তরদাতার পরিবেশের উপর গবেষকের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না

বলে উত্তরদাতা নিজে প্রশ্নমালা পূরণ করছেন কি না, তা যাচাই করার কোন উপায় গবেষকের থাকে না। উত্তরদাতা ছাড়া অন্য যে কেউ প্রশ্নমালাটি পূরণ করে দিতে পারেন। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এ বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করতে পারেন, যা ডাক প্রশ্নমালায় সম্ভব হয় না।

পক্ষপাতমূলক নমুনা নির্বাচন (Biased Sample Selection): ডাক প্রশ্নমালায়, যেহেতু উত্তরদাতাকে নিজেই প্রশ্নমালা পূরণ করতে হয়, সেহেতু এটি পরিচালনার জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নমুনা নির্বাচন করতে হয়। নিরক্ষর, বা কম শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এর আওতার বাইরে থেকে যায় বলে নির্বাচিত নমুনাটি একপেশে হয়ে যেতে পারে। সে কারণে, অনেকে ডাক প্রশ্নমালাকে উপাত্ত সংগ্রহের একটি কার্যকর হাতিয়ার বলে মনে করেন না।

সারাংশ

স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা উপাত্ত সংগ্রহের অন্যতম একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা পুরণে উত্তরদাতা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। সাধারণতঃ, যে সব সমাজে শিক্ষার হার বেশী, সে সব সমাজে স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা বেশী উপযোগী হয়ে থাকে। ডাক প্রশ্নমালার অন্যতম দূর্বলতা হচ্ছে উত্তরের হার কম হয়। তবে সুবিধার দিকটি হচ্ছে, উত্তরদাতার প্রভাবহীন উত্তরদানের ফলে যথাযথ মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব হয় বেশী। বর্তমান পাঠে, স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। যেমন, প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ, সুবিধা ও অসুবিধা, ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। ডাক প্রশ্নমালার প্রধান অসুবিধাটি হলো:

ক. এতে অর্থ বেশী লাগে
খ. এতে উত্তর ফেরৎ প্রাপ্তির হার কম
গ. এতে উত্তর অসম্পূর্ণ হওয়ার হার বেশী
ঘ. এতে সময় লাগে বেশী।

২। ডাক জরিপে উত্তর প্রাপ্তির হার বেশী হয়, যখন:

ক. গবেষণার বিষযবস্তু স্বচ্ছ থাকে
খ. প্রশ্নমালাটি সম্পর্কে উত্তরদাতার মনোভাব সন্দেহমুক্ত থাকে
গ. প্রশ্নমালা পূরণের সহজসাধ্যতা থাকে
ঘ. উপরের সব।

৩। প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ পাঠান না, এমন উত্তরদাতাদের _____ দলে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ডাক প্রশ্নমালা কী?

২। ডাক প্রশ্নমালার অসুবিধাগুলো কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ডাক প্রশ্নমালা কতটুকু ফল দেবে বলে আপনি মনে করেন? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। স্ব-পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালা ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ - ৪

সাক্ষাৎকার
Interview

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- সাক্ষাৎকার কি
- সাক্ষাৎকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- সাক্ষাৎকারকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
- সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ
- সাক্ষাৎকারের সুবিধা ও অসুবিধা
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কার্যাবলী

সাক্ষাৎকার কি (What is an Interview)?

উপাত্ত সংগ্রহের যে কোন কৌশলের তুলনায়, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হলো সবচেয়ে বেশী সমাজবৈজ্ঞানিক প্রকৃতির। কারণ, সাক্ষাৎকার হচ্ছে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সেই দু'জন ব্যক্তির একজন হলেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও অন্যজন হলেন, উত্তরদাতা। সাধারণভাবে, উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতা ও প্রশ্নকর্তার মধ্যে মৌখিক আদান-প্রদানকে সাক্ষাৎকার বলা যায়। উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের সাহায্যে একটি মুখোমুখি পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ব্যক্তিগতভাবে উত্তরদাতার কাছে উপস্থিত হয়ে পূর্ব-নির্ধারিত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং সাক্ষাৎকারের সময়ই সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলো লিপিবদ্ধ করেন। প্রশ্ন করার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাধারণতঃ একটি কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করে থাকেন। উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলো তিনি সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে লিপিবদ্ধ করেন। কখনো কখনো, সহযোগী মাধ্যম হিসাবে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে, সাক্ষাৎকারটি যদি খুব কাঠামোবদ্ধ না হয়, সে ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার নির্দেশনা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতএব, সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, সাক্ষাৎকার হলো মুখোমুখি পরিস্থিতিতে সম্পাদিত একটি আন্তর্ব্যক্তিক আলাপচারিতামূলক বিনিময়, যেখানে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গবেষণা অনুকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তরগুলো পাবার জন্য উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করেন।

সাক্ষাৎকারের প্রকৃতিকে বুঝতে হলে, সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি, তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকারের প্রকৃতিটি কি হবে, এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন মত রয়েছে। একদল পন্ডিত মনে করেন যে, সাক্ষাৎকার হলো, যে কোন ধরণের মুখোমুখি আলাপচারিতমূলক ভাবের আদান-প্রদান, যেখানে একজন অন্যজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। অন্যেরা মনে করেন যে, সাক্ষাৎকার মুখোমুখি পরিস্থিতিতে হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তবে, তারা এ ক্ষেত্রে মর্যাদার সমতা ও তুলনাযোগ্যতার উপর জোর দিয়েছেন। তাদের মতে, সাক্ষাৎকার হলো, দু'জন ব্যক্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক, যেখানে দু'জনই এমনভাবে আচরণ করেন, যেন প্রকৃতপক্ষে না হলেও, তারা সাক্ষাৎকার চলাকালীন সময়ের জন্য একই মর্যাদার অধিকারী এবং যেখানে তাদের আচরণ, এ রকম আরো সমরূপ পরিস্থিতির মতই অর্থবহ। এ দু'টি সংজ্ঞার কোনটিই সাক্ষাৎকারের পূর্ণ প্রকৃতিকে প্রকাশ করে না। অতএব, সাক্ষাৎকারের প্রকৃতিকে বুঝতে হলে, সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি, তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Salient Features of Interview)

সাক্ষাৎকারের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হলো যে, উত্তরদাতাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় মৌখিকভাবে এবং তিনি উত্তরগুলো প্রদানও করেন মৌখিকভাবে। এই মৌখিকভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি সাক্ষাৎকারের তিনটি প্রসঙ্গকে গুরুত্বের সাথে নির্দেশ করে। *প্রথমতঃ*, সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র আলাপচারিতামূলক বাক্য বিনিময় নয়। এটি এমন ধরণের কথোপকথন, যেখানে প্রধান তাড়নাটি থাকে মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের মাধ্যমে মৌখিকভাবে উত্তর প্রাপ্তির উপর। *দ্বিতীয়তঃ*, এই মৌখিক আলাপচারিতামূলক বিনিময়গুলো মুখোমুখি উপস্থিত হয়ে করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। টেলিফোনের মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে, যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতার মধ্যে মিথষ্ক্রিয়াটি হতে হবে মৌখিকভাবে। *তৃতীয়তঃ*, যদিও সাধারণভাবে কথোপকথনটি দু'জন ব্যক্তির মধ্যে হয়ে থাকে, কিন্তু সাক্ষাৎকার দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন আবশ্যকীয়তা নেই। যেমন, স্বামী ও স্ত্রীর সাক্ষাৎকার একই সাথে নেয়া যেতে পারে। পিতা-মাতা ও সন্তানদের সাথে একই সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এমনকি, দলীয়ভাবেও আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো যে, তথ্যগুলোকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী লিপিবদ্ধ করেন, উত্তরদাতা নয়। উপাত্ত সংগ্রহের অন্যান্য কৌশলগুলোও সাক্ষাৎকারের এই বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে। যেমন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতিতেও তথ্যকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। কিন্তু মুখোমুখি হয়ে মৌখিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ সাক্ষাৎকারের একটি অবশ্য পালনীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতার মধ্যে সম্পর্কটি বিভিন্নভাবে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এটি একটি ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক। স্থায়ীত্বের সময়কাল এবং প্রশ্নোত্তর ধরণের আলাপচারিতামূলক বিনিময়, উভয় দিক থেকেই এই সম্পর্কটির একটি নির্ধারিত শুরু এবং শেষ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্পর্কটি এমন যে, সেখানে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবং উত্তরদাতা উভয়েই একে অপরের কাছে অপরিচিত ব্যক্তি। ফলে, দু'জনের কাছেই এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাক্ষাৎকারের আঙ্গিক ও রীতির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান নমনীয়তার বিষয়টিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপাত্ত সংগ্রহের খুব কম হাতিয়ারই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার এত বেশী বৈচিত্র প্রদান করে থাকে। কাঠামোগত ভিন্নতার এই বৈশিষ্ট্যটি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতাকে প্রশ্ন এবং উত্তর উপলব্ধির জন্য পারস্পরিকভাবে উচ্চমাত্রায় সুযোগ প্রদান করে।

সাক্ষাৎকারকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors Affecting the Interview)

উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসাবে, সাক্ষাৎকার একটি উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। যদি একজন উত্তরদাতা কথা বলতে পারেন, তবে ধরে নেয়া যায় যে, একটি সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার প্রদানে আগ্রহী থাকেন এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সফল হন, তবে একটি সফল ও মানসম্পন্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়। একটি সফল সাক্ষাৎকারের জন্য তিনটি উপাদান কার্যকর থাকে। *প্রথমতঃ*, একটি পূর্বাপর পরীক্ষিত সাক্ষাৎকার অনুসূচী। *দ্বিতীয়তঃ*, সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পর্যাপ্ত পরিচিতি। *তৃতীয়তঃ*, উত্তরদাতাকে বিশ্বাস, সম্মান এবং সৌজন্যের সাথে বিবেচনা করা। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন অনেক উপাদান রয়েছে। তবে, এর মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণগত মান, উত্তরদাতার গুণগত মান এবং গবেষণাধীন সমস্যাটির প্রকৃতি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান না হলে গবেষণার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হিসাবে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা উচিৎ, যাদের একটি কৌতুহলী মন রয়েছে, যারা যে কোন নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থকে অপরিবর্তিত রেখে নিজের মত করে ব্যাক্যের পুনর্বিন্যাস করতে পারেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণগত মান (Qualities of the Interviewer): সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে — একটি হলো ভাবগত এবং অন্যটি হলো বস্তুগত। ভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হিসাবে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা উচিৎ, যাদের একটি কৌতুহলী মন রয়েছে, যারা যে কোন নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থকে অপরিবর্তিত রেখে নিজের মত করে ব্যাক্যের পুনর্বিন্যাস করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে, সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত উত্তরদাতা ছাড়াও পরিবারের অন্য সদস্যদের নির্বাচন করতে পারেন, এবং সর্বোপরি, যে কোন এলোমেলো বক্তব্যকে গুছিয়ে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যকে লিপিবদ্ধ করতে পারেন। বস্তুগত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নারী-পুরুষ পরিচয়, বয়স, সামাজিক অবস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা বলার ভঙ্গি, ইত্যাদি। উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার দেবেন কি না, বা কতটুকু সহযোগিতা করবেন, সেটি নির্ধারণে এ সকল বৈশিষ্ট্য উত্তরদাতার মনে তাৎক্ষণিকভাবে কেবল একটি ছাপই ফেলে না, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ভূমিকা পালনে কিছুটা সীমাবদ্ধতাও তৈরি করে।

সঠিকভাবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে, একজন সাধারণ ব্যক্তিও ভালোভাবে পরিকল্পিত ও পরিমিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন।

সাক্ষাৎকার প্রদানকালে উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, পরিমাপ করেন এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন যে, গবেষণার প্রসঙ্গটি সম্পর্কে উত্তরদাতা যেভাবে উত্তর দেবেন, তা তাকে কোনভাবে প্রভাবিত করবে কি না। কোন কথা বলার পূর্বে, তারা একে অপরকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে তারা একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারেন। সুতরাং, একটি বিষয় এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে কেবল তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার একটি উপায় হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না, বরং লিপিবদ্ধকৃত উত্তরকেও তিনি যে প্রভাবিত করতে পারেন, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের সঠিকতা বৃদ্ধির জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে এবং কতগুলো বিষয়ের উপর তার বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, কিভাবে তিনি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন, কিভাবে তিনি পক্ষপাতহীনভাবে উত্তরদাতাকে প্রোৎসাহিত করবেন, কিভাবে নিজের অনুমোদনমূলক মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে উত্তরদাতাকে তার নিজস্ব মত প্রকাশে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, কিভাবে নিজের উপস্থাপনা উত্তরদাতার উত্তরকে সবচেয়ে কম প্রভাবিত করবে, ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায় যে, সঠিকভাবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে, একজন সাধারণ ব্যক্তিও ভালোভাবে পরিকল্পিত ও পরিমিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন।

উত্তরদাতার মান (Qualities of Respondents): যেহেতু সাক্ষাৎকার হলো এক ধরণের কথোপকথন, সেহেতু সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মত উত্তরদাতার মানটিও একটি সফল সাক্ষাৎকারের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যাদেরকে উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হবে, তাদের নিজেদের মতামতকে মৌখিকভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কথা বলতে পারেন না, কানে শোনেন না, খুব অল্প বয়স্ক, বা মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচিত করলে সাক্ষাৎকারটি কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। প্রশ্নের যথার্থ জবাব দেবার জন্য উত্তরদাতার প্রেষণা থাকতে হবে। অর্থাৎ, সাক্ষাৎকার কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণ করার এবং সাক্ষাৎকার চালিয়ে যাবার মতো উৎসাহ থাকতে হবে। তবে, এই প্রেষণা ও উৎসাহ অনেকাংশে নির্ভর করে, গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে উত্তরদাতার ধারণা ও পরিচিতি রয়েছে কি না, তার উপর। অর্থাৎ, উত্তরদাতার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সহজলভ্য হতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে, উত্তরদাতা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। উত্তরদাতার কাছ থেকে কি চাওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Problem): যে বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে, সেটিও সাক্ষাৎকারকে প্রভাবিত করতে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতা নির্বাচনে যত যত্নই নেয়া হোক না কেন, এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য বের করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, অধিকাংশ মানুষই তাদের আয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে চান না। একইভাবে, যৌন আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করাও কঠিন। অর্থাৎ, খুব বেশী ব্যক্তিগত ও স্পর্শকাতর বিষয়ে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা উত্তরদাতার পক্ষে

মৌখিকভাবে উপস্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বলে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে তা গবেষণা করা যায় না। সাক্ষাৎকারের গুণগত মান যথাযথ গবেষণা নক্শার উপরও নির্ভরশীল। সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো যদি জরিপের উদ্দেশ্য পূরণে পর্যাপ্ত না হয়, অথবা প্রশ্নগুলো যদি অমার্জিতভাবে উপস্থাপন করা হয়, তবে একজন দক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীও যথার্থ ও কার্যকর উপাত্ত সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হতে পারেন।

সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো যদি জরিপের উদ্দেশ্য পূরণে পর্যাপ্ত না হয়, অথবা প্রশ্নগুলো যদি অমার্জিতভাবে উপস্থাপন করা হয়, তবে একজন দক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীও যথার্থ ও কার্যকর উপাত্ত সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হতে পারেন।

সাক্ষাৎকারের প্রকারভেদ (Types of Interview)

সাক্ষাৎকারের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, এ বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। কেউ বলেছেন যে, সাক্ষাৎকার মুখোমুখি হতে হবে এবং অন্যেরা বলেছেন যে, মুখোমুখি হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই, কেন না টেলিফোনের মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যায়। এ ছাড়াও, উপাত্ত সংগ্রহের হাতিয়ারের মধ্যে ভিন্নতার কারণে সাক্ষাৎকারের কাঠামোগত ভিন্নতা তৈরি হয়। এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় রেখে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির বিভিন্ন ধরণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

নির্দেশনাবিহীন সাক্ষাৎকার (Nondirective Interview): সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে নমনীয় ধরণটি হলো, নির্দেশনাবিহীন সাক্ষাৎকার। এখানে পূর্ব–নির্ধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কোন সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করেন না, অথবা কোন সুনির্দিষ্ট বিন্যাস অনুযায়ী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছ থেকে খুব সামান্য নির্দেশনা নিয়ে, অথবা কখনো কখনো কোন নির্দেশনা ছাড়াই গবেষণাধীন বিষয় সম্পর্কে উত্তরদাতা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, তার বিবেচনায় গুরুত্বপুর্ণ ঘটনাগুলো তুলে ধরেন, পরিস্থিতির সংজ্ঞায়ন করেন এবং তার নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। এখানে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীও অনেক বিষয় উত্থাপন করার এবং কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেন।

অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Non-Schedule-Structured Interview): সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় মূল ধরণটি হলো, অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার। এর চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। *প্রথমতঃ*, এটি বিশেষ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংঘটিত হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, এটি এমন একটি পরিস্থিতিতে হয়, যা সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে। *তৃতীয়তঃ*, এটি গবেষণা অনুকল্পের সাথে সম্পর্কিত প্রসঙ্গের উপর প্রস্তুতকৃত সাক্ষাৎকার নির্দেশনার ভিত্তিতে এগিয়ে যায়। *চতুর্থতঃ*, এটি গবেষণাধীন পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তরদাতার অভিজ্ঞতার উপর কেন্দ্রীভূত হয়। যদিও প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার মধ্যে সম্পর্কটি আনুষ্ঠানিক, তবুও গবেষণার যে কোন বিষয়ে মতামত দেবার মতো যথেষ্ট স্বাধীনতা উত্তরদাতার রয়েছে। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষক উত্তরদাতার ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, ক্রিয়াকলাপ, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যেহেতু পরিস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত থাকেন, সেহেতু তথ্যের মধ্যে যে কোন অসামঞ্জস্যতা বা অসংগতির ব্যাপারে তিনি সাবধান ও সংবেদনশীল থাকেন।

অনুসূচী-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Schedule-Structured Interview): সাক্ষাৎকারের সবচেয়ে কম নমনীয় ধরণটি হলো, অনুসূচী-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার। অনুসূচীবদ্ধ সাক্ষাৎকারে, উত্তরদাতার জন্যে নির্ধারিত প্রশ্নের সংখ্যা এবং শব্দবিন্যাসে কোন ভিন্নতা থাকে না। সেজন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে প্রশ্নগুলোর জন্য বার বার নতুন শব্দ প্রয়োগ, বা প্রশ্নের নতুন বিন্যাস তৈরী করতে হয় না। তবে, উত্তরদাতা কোন প্রশ্ন বুঝতে না পারলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সেটির ব্যাখ্যা দিতে পারেন। অনুসূচী-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই প্রশ্নের ক্রমবিন্যাসগুলো একই রকম থাকে। এটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের মধ্যে ভিন্নতা যেন উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যের জন্যই হয়, সাক্ষাৎকারের ভিন্নতার জন্য নয়। এটি নিশ্চিত করার জন্যই গবেষক সাধারণতঃ অনুসূচী-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

অনুসূচী-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই প্রশ্নের ক্রমবিন্যাসগুলো একই রকম থাকে।

অনুসূচী-কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার তিনটি পূর্ব অনুমানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, প্রতিটি গবেষণাতেই উত্তরদাতাদের কিছু সাধারণ শব্দ জ্ঞান থাকতে হবে এবং প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ সবার কাছে একই রকম হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নমালায় বিন্যস্ত প্রশ্নগুলোর যৌক্তিকতা প্রত্যেক উত্তরদাতার কাছে একই রকম হতে হবে। তৃতীয়তঃ, যদি প্রত্যেক উত্তরদাতার কাছে প্রশ্নের অর্থ একই রকম হয়, তবে এর প্রেক্ষাপটও অবশ্যই একই রকম হতে হবে এবং যেহেতু সকল প্রশ্ন সেই প্রেক্ষাপটের অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেহেতু প্রশ্নগুলোর অনুক্রমও একই থাকতে হবে।

টেলিফোন সাক্ষাৎকার (Telephone Interview): টেলিফোনের মাধ্যমে সম্পাদিত সাক্ষাৎকারেও সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহৃত হয়। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের সুবিধাগুলো টেলিফোন সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। কিন্তু এর বাড়তি সুবিধা হলো যে, এতে অল্প খরচে এবং দ্রুততার সাথে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। যদিও সামাজিক বিজ্ঞান অপেক্ষা বাজার গবেষণায় টেলিফোন সাক্ষাৎকারের জনপ্রিয়তা বেশী, সামাজিক গবেষণায়ও এটি যথেষ্ট কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটার প্রযুক্তিতে উন্নয়নের ফলে টেলিফোন সাক্ষাৎকার আরো অনেক সহজ হয়েছে। কম্পিউটারের সহযোগিতায় টেলিফোন সাক্ষাৎকার (computer-assisted telephone interviewing, বা CATI) পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পরিচিতি, যথাযথ ছাকনী প্রশ্নসহ সক্ষাৎকার অনুসূচীর দফাগুলোকে প্রদর্শন এবং উত্তরদাতার উত্তরগুলোকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরগুলোকে সরাসরি কম্পিউটারে সাংকেতীকরণ করে ফেলতে পারেন। টেলিফোন সাক্ষাৎকারে উত্তর পাবার হার অনেক বেশী হয়। যারা ডাক প্রশ্নমালায় উত্তর দেন না, বা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও যারা অস্বীকৃতি জানান, টেলিফোন সাক্ষাৎকার তাদেরকে উত্তর প্রদানের সুযোগ করে দেয়।

টেলিফোন সাক্ষাৎকারের অসুবিধাও রয়েছে। এর প্রধান অসুবিধাটি হলো যে, যারা দরিদ্র, যুবক, অসুস্থ কিংবা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, কিংবা যারা অধিকাংশ সময়ই টেলিফোনের কাছে থাকেন না, বা যাদের টেলিফোন নেই, তারা সাক্ষাৎকারের আওতার বাইরে থেকে যান। দূর থেকে স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন করাও কঠিন। উপরন্তু, মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের তুলনায় টেলিফোন সাক্ষাৎকার অনেকটাই ভিন্ন এবং টেলিফোন সাক্ষাৎকারের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার প্রয়োজন হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতাকে প্রত্যক্ষ করে তার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান না । সুতরাং, তাকে অবশ্যই খুব স্পষ্টভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন এবং খুব যত্ন সহকারে উত্তর শুনে বুঝতে হয় যে, প্রশ্ন বুঝতে উত্তরদাতার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না। সাক্ষাৎকারটি যদি পূর্ব-নির্ধারিত না হয়, তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতার পূর্ণ মনোযোগ নাও পেতে পারেন। সাক্ষাৎকার শেষ হবার আগেই উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার দেয়া বন্ধ করে দিতে পারেন।

সাক্ষাৎকারের সুবিধা (Advantages of Interview)

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির অন্যতম প্রধান সুবিধাটি হলো এর নমনীয়তা। সাক্ষাৎকারের সময় সুনির্দিষ্ট উত্তর পাবার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতাকে প্রোৎসাহিত করতে পারেন এবং উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর শুনে যদি মনে হয় যে, উত্তরদাতা প্রশ্নটি বুঝতে পারেন নি, তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন। *দ্বিতীয়তঃ*, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে উত্তর প্রাপ্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী হয়ে থাকে। যারা একটি নৈর্ব্যক্তিক ডাক প্রশ্নমালা পূরণের জন্য সময় দেন না, তারাও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর অনুরোধে সাড়া দেন। এমন কি, যারা পড়তে, লিখতে, বা ভাষা বুঝতে পারেন না, তাদের ক্ষেত্রেও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি প্রয়োগ সহজ, যা ডাক প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। *তৃতীয়তঃ*, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার পরিস্থিতির উপর গবেষকের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে। একটি সাক্ষাৎকারের পরিবেশে সাক্ষাৎকারগুলো একান্তে পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য গবেষক পরিবেশকে পরিমিত করতে পারেন এবং নির্বাচিত উত্তরদাতার উত্তরদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন। *চতুর্থতঃ*, এ পদ্ধতিতে প্রশ্নের ক্রমবিন্যাসের উপর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণ থাকে। উত্তরদাতা প্রশ্নের উত্তর সঠিক ক্রমবিন্যাসে দিচ্ছেন কি না, অথবা পরবর্তী প্রশ্ন করার আগেই

পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন কি না, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দক্ষতার সাথে নিশ্চিত করতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, এতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সঠিক সময় ও অবস্থান লিপিবদ্ধ করতে পারেন। ফলে, গবেষক প্রাপ্ত উত্তরগুলো আরো যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। সাক্ষাৎকারের সময় ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা যদি উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের উপর কোন প্রভাব রাখে, তবে সে ক্ষেত্রে সময় জানা থাকলে সেই ঘটনার পূর্বে ও পরে প্রদত্ত উত্তরগুলোর মধ্যে তুলনা করে দেখতে পারেন। *ষষ্ঠতঃ*, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এ সব তথ্যের মধ্যে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও তাদের পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য থাকতে পারে, যা ফলাফল বিশ্লেষণের সময় গবেষককে সাহায্য করে। *সপ্তমতঃ*, একটি সাক্ষাৎকার পরিস্থিতিতে উত্তরদাতার অমৌখিক এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা যায়, যা উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সময় মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। *অষ্টমতঃ*, এ পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করা যায়।

সাক্ষাৎকারের অসুবিধা (Disadvantages of Interview)

সাক্ষাৎকার পদ্ধতির বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। *প্রথমতঃ*, এটি ডাক প্রশ্নমালা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকার অনুসূচী প্রণয়ন, ছাপানো, নমুনা নির্বাচন, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, তদারকি, বেতন, ভ্রমণ, ইত্যাদি খাতে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। তাছাড়া, বিশেষ করে অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে, উপাত্ত লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। *দ্বিতীয়তঃ*, সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ এবং ভ্রমণে অনেক সময় লাগে বলে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বেশ সময়সাপেক্ষ। অনেক সময়, একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য উত্তরদাতার কাছে কয়েকবার যেতে হয়। *তৃতীয়তঃ*, অধিকতর নমনীয়তা সাক্ষাৎকার পদ্ধতির প্রধান সুবিধা বলে বিবেচিত হলেও সেটি অনেক সময় প্রশ্নকর্তার ব্যক্তিগত প্রভাব ও পক্ষপাতিত্বের সুযোগ তৈরি করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে এবং ব্যক্তিগত মতামত না দেবার জন্য বলা হলেও তারা সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় উত্তরদাতাকে এমন কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতে পারেন, যা তার উত্তরকে প্রভাবিত করতে পারে। এমন কি, তিনি মৌখিকভাবে বিভিন্ন সূত্র প্রদান এড়িয়ে যেতে পারলেও তার শারীরিক অভিব্যক্তি বা ইঙ্গিতের প্রভাবগুলোকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না।

চতুর্থতঃ, এ পদ্ধতিতে উত্তরদাতার পক্ষে কোন দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখা, বা কোন তথ্যকে যাচাই করে দেখার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলোচনার কোন সুযোগ থাকে না, যা ডাক প্রশ্নমালায় উত্তরদাতাকে একটি বড় সুবিধা প্রদান করে। *পঞ্চমতঃ*, উত্তরদাতাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎকার দিতে হয় বলে এটি উত্তরদাতার জন্য অসুবিধা তৈরি করে। ক্লান্তি, অসুস্থতা, বা ব্যস্ততাজনিত কারণে অপ্রস্তুত থাকলেও উত্তরদাতাকে সাক্ষাৎকারের অংশগ্রহণ করতে হয়, যা উপাত্তের মানের উপর প্রভাব ফেলে থাকে। *ষষ্ঠতঃ*, সাক্ষাৎকারের সময় উত্তরদাতার পরিচিতি গবেষণার ফলাফলে প্রতিফলিত হবে না, এমন প্রতিশ্রুতি থাকলেও উত্তরদাতা জানেন যে, এতে ডাক প্রশ্নমালার মতো নামহীনতা বা গোপনীয়তা থাকে না। কারণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে ন্যুনতম পক্ষে উত্তরদাতার নাম, ঠিকানা ও নমুনা নম্বর থাকে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে উত্তরদাতার সাথে পরিচিত হয়ে যান। এতে করে, উত্তরদাতা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন, বিশেষ করে যদি কোন প্রসঙ্গ বা প্রশ্নের প্রতি উত্তরদাতার স্পর্শকাতরতা থাকে। *সপ্তমতঃ*, রাজনৈতিক সংঘাত, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, বা দুর্গমতার কারণে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অনেক উত্তরদাতার কাছে পৌঁছতে পারেন না বলে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয় না। এর ফলে উত্তরপ্রাপ্তির হার নিম্ন হয়ে যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কার্যাবলী (The Interviewers' Task)

সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র উপাত্ত সংগ্রহের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি শিল্পকলা।

সাক্ষাৎকার শুধুমাত্র উপাত্ত সংগ্রহের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি শিল্পকলা। একটি সফল সাক্ষাৎকারের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, যে কোন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, নমনীয়তা, উদারতা, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, ইত্যাদি গুণাবলীর উপস্থিতি একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। যদিও সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কোন কঠিন নিয়ম নেই, তবুও একটি সফল সাক্ষাৎকার অর্জনের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে চারটি প্রধান কাজ করতে হয়, নিম্নে সেগুলোকে আলোচনা করা হলো।

নমুনা সদস্যদের খুঁজে বের করা (Finding Sample Members): উত্তরদাতা খুঁজে বের করা কতখানি কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ হবে, তা নির্ভর করে গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনায়ন প্রক্রিয়ার উপর। যেমন, কোটা নমুনায়নে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিজের পছন্দ অনুযায়ী নমুনা নির্বাচন করেন এবং তাদের পছন্দের স্বাধীনতা থাকে অনেক বেশী । কিন্তু দৈবচয়িত নমুনায়নে, তাদের নিজস্ব পছন্দের কোন স্বাধীনতা থাকে না। যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে, তাদের নাম ঠিকানাসহ নির্ধারিত একটি তালিকা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে দিয়ে দেয়া হয়। একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য বরাদ্দকৃত নমুনা একটি শহর বা জেলা জুড়ে বিস্তৃত থাকতে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর দায়িত্ব হলো, তাদের খুঁজে বের করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কেবল তার সুবিধা অনুযায়ী কোথা থেকে শুরু করবেন এই স্বাধীনতাটুকু ভোগ করেন। সাক্ষাৎকারের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা (যেমন, পূরণকৃত প্রশ্নমালা, উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি, প্রথম চেষ্টায় সাক্ষাৎ না পাওয়া এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কতবার উত্তরদাতার কাছে যেতে হয়, ইত্যাদি) থেকে বিভিন্ন রকমের উত্তর অপ্রাপ্তিকে কিভাবে সামলাতে হবে, সে ব্যাপারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের নির্দেশনা দেয়া থাকে।

উত্তরদাতার কাছে বার বার যাওয়ার বিষয়টি সম্ভবতঃ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর করণীয় সকল কর্মকান্ডের মধ্যে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক একটি কাজ। একটি প্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করা হয়, তা একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সহজে ধরা নাও পড়তে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী একজন প্রার্থী সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে গবেষণা এবং সাক্ষাৎকার পরিচালনার প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি শহরের রাস্তায় হাটতে, বা গ্রামের প্রথম প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলাচল করতে অপছন্দ করেন, কিংবা মানচিত্র পড়তে অসমর্থ হন, তবে তেমন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিয়োগকর্তার জন্য নিছক একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ান।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ, আলোচনামূলক এবং পক্ষপাতহীন হতে হবে। তাকে খুব বেশী কঠোর বা খুব প্রাণবন্ত, খুব বাচাল বা খুব ভীরু, এর কোনটিই হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Obtaining Interview): একটি সফল সাক্ষাৎকারের প্রধান শর্ত হলো, উত্তরদাতার সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে একটি সুন্দর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে এবং এমন একটি প্রশ্নমালা থাকতে হবে, যার শুরু হবে সহজ ও সাবলীলভাবে। উত্তরদাতাকে খুঁজে পাবার পর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকার শুরু করবেন। শুরুতে তিনি যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তার পরিচয় দিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তার পরিচয় পত্র প্রদর্শন করবেন। অনেক ক্ষেত্রে, এই পরিচয়ের পাশাপাশি গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। এর ফলে, সহজেই উত্তরদাতার সহযোগিতা লাভ করা যায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ভূমিকাটি হতে হবে সংক্ষিপ্ত, অনানুষ্ঠানিক এবং ইতিবাচক। কোন গোপনীয় বা ব্যক্তিগত তথ্য জানতে হলে, উত্তরদাতাকে তা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। নুমনা কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে এবং উত্তরদাতার কাছ থেকে ঠিক মতো সহযোগিতা না পেলে গবেষণার ফলাফল যে প্রতিনিধিত্বশীল হবে না, এ বিষয়গুলো উত্তরদাতাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ, আলোচনামূলক এবং পক্ষপাতহীন হতে হবে। তাকে খুব বেশী কঠোর বা খুব প্রাণবন্ত, খুব বাচাল বা খুব ভীরু, এর কোনটিই হওয়ার প্রয়োজন নেই। মূল কথা হলো, উত্তরদাতার জন্য পরিবেশটিকে এমন সহজ করে তুলতে হবে, যেন তিনি মুক্ত মনে কথা বলতে পারেন। এ ক্ষেত্রে, দিনের আবহাওয়া, বাড়িটির সৌন্দর্য্য, সুন্দর ফুলবাগান, বা সন্তানাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য দু'জনের সম্পর্ককে সহজ করতে সাহায্য করবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে প্রত্যাশাটি হলো যে, তিনি সব প্রযোজ্য প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন, যে অনুক্রমে প্রশ্নগুলো দেয়া রয়েছে সেই অনুক্রমেই জিজ্ঞাসা করবেন, প্রোৎসাহিত করার জন্য যতটুকু নির্দেশনা দেয়া থাকবে ঠিক ততটুকুই করবেন এবং শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন রকম অপ্রয়োজনীয় ভিন্নতা আনবেন না।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা (Asking Questions): অধিকাংশ বৃহত্তর গবেষণার মূল লক্ষ্যটি হলো, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণতা বজায় রাখা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে প্রত্যাশাটি হলো যে, তিনি সব প্রযোজ্য প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন, যে অনুক্রমে প্রশ্নগুলো দেয়া রয়েছে সেই অনুক্রমেই জিজ্ঞাসা করবেন, প্রোৎসাহিত করার জন্য যতটুকু নির্দেশনা দেয়া থাকবে ঠিক ততটুকুই করবেন এবং শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন রকম অপ্রয়োজনীয় ভিন্নতা আনবেন না। তবে এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কোন যন্ত্র নয়। তাদের কণ্ঠ, আচরণ, শব্দের উচ্চারণ, সুর, ইত্যাদি তাদের চেহারার মতোই ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন প্রশিক্ষণই সব সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে একই রকম সঙ্গতিপূর্ণতা আনতে পারে না। নিত্যদিনের ব্যবহার্য শব্দমালা দিয়ে যদি প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়, তাহলে প্রশ্নের বাক্য গঠনকে রূপান্তরের প্রবণতা কম লক্ষ্য করা যাবে।

উত্তরদাতারা কখনো কখনো অপর্যাপ্ত উত্তর দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তার দক্ষতা ব্যবহার করে উত্তরদাতার কাছ থেকে সঠিক সম্পূর্ণ উত্তরটি বের করে আনবেন। অপর্যাপ্ত উত্তরের পাঁচটি প্রধান লক্ষণকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন,

- **আধা উত্তর:** যেখানে উত্তরদাতা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু অসম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করেন।
- **উত্তরহীনতা:** যখন উত্তরদাতা নিশ্চুপ থাকেন, বা উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি জানান।
- **অপ্রাসঙ্গিক উত্তর:** যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, উত্তরদাতা তার সাথে সম্পর্কিত উত্তর দেন না।
- **ভুল উত্তর:** যখন উত্তরগুলো পক্ষপাতদুষ্ট ও অযথার্থ হয়।
- **উত্তর প্রদানে সমস্যা:** কখনো কখনো, উত্তরদাতা উত্তর দিতে পারেন না। হয়তো পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে তিনি প্রশ্নটি বুঝতে পারেন না, অথবা তিনি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকে অপ্রাসঙ্গিক, বা যথার্থ নয় বলে মনে করেন।

উত্তর লিপিবদ্ধকরণ (Recording Answers): উত্তর লিপিবদ্ধ করাকে মনে হতে পারে যথেষ্ট সহজ একটি কাজ। কিন্তু মাঝে মাঝে, কিছু কিছু কারণে এখানেও ভুল হতে পারে। *প্রথমতঃ*, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটি নিতান্ত ক্লান্তিকর। দৈবচয়িত নমুনায়নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে খুঁজে পাবার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়। উত্তরদাতাকে পাবার পর তাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মত দীর্ঘ, জটিল ও ক্লন্তিকর কাজটিকে বারবার করতে হয়। যদি কোন কারণে তিনি হেনস্তা হন, কিংবা উত্তরদাতার উপর রেগে যান, বিশেষ করে যখন উত্তরদাতা ঠিকমতো সহযোগিতা করেন না, তাকে হয়তো খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। *দ্বিতীয়তঃ*, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে প্রায়শঃ, বেশ জটিল নির্দেশনা অনুযায়ী সাংকেতীকরণ করতে হয়। *তৃতীয়তঃ*, শুধুমাত্র একটি কাজে পূর্ণ মনযোগ দেয়া তার পক্ষে সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, একদিকে, তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন এবং অন্যদিকে, তিনি পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য প্রস্তুতি নেন, কিংবা প্রশ্ন করেন। আবার একইসাথে, তাকে সন্দেহপূর্ণ ও ব্যাখ্যাযোগ্য উত্তরগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। *চতুর্থতঃ*, পূর্ব-নির্ধারিত সাংকেতীকরণ করা প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাজ হলো ঠিক সংকেতটি নির্বাচন করে বৃত্তাকার করা। ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন, বা অসচেতনভাবে ভুল সংকেত নির্বাচন করলে গবেষণার ফলাফলে ভ্রান্তি প্রবেশ করবে। *পঞ্চমতঃ*, খোলা প্রশ্নের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধকরণের কাজটি আরো কঠিন। উত্তরদাতা যা কিছু বলেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কি তার সবকিছুই লিপিবদ্ধ করবেন, না কি শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক মনে হয় এমন কথাগুলো লিপিবদ্ধ করবেন, না কি উত্তরদাতার প্রদত্ত উত্তরগুলো তিনি নতুন বাক্য বিন্যাসে উপস্থাপন করবেন? এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণগত নির্দেশাবলীর বাইরেও তাকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষ করার সময়, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অবশ্যই সাক্ষাৎকার অনুসূচীকে পরীক্ষা করে দেখবেন যে, তিনি সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন কি না, সব প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন কি না, যথাযথ উত্তর-দফা বা সংকেতকে বৃত্তাবর্ত করেছেন কি না এবং উত্তরগুলোর মধ্যে কোন অসঙ্গতি

রয়েছে কি না। এর সাথে তিনি, সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের উপর টোকামূলক মন্তব্য লিখবেন। যেমন, উত্তরদাতা কোন ধরণের পরিবেশে বাস করেন, তিনি কি ধরণের ব্যক্তি, গবেষণা সম্পর্কে উত্তরদাতার মনোভাব, উত্তরগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর ধারণা, ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যত বেশী তার মন্তব্যকে সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করবেন, উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায়, তা তত বেশী উপযোগী তথ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

সারাংশ

সামাজিক গবেষণায়, সাক্ষাৎকার একটি বহুল পরিচিত পদ্ধতি। দু'জন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার একটি সামাজিক প্রকরণ হলো সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য, হলো প্রশ্নকর্তা উত্তরদাতার কাছে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতা উত্তর দেন, যা প্রশ্নকর্তা সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে লিপিবদ্ধ করেন। লিপিবদ্ধকৃত উত্তরগুলোই উপাত্তের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সাক্ষাৎকারের গুণগত মান নির্ভর করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণগত মান, উত্তরদাতার গুণগত মান এবং সর্বোপরি সাক্ষাৎকারের জন্য নির্মিত সাক্ষাৎকার অনুসূচী। এই তিনটি বিষয় যদি মানসম্মত হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি পেশাদার হন, তাহলে গবেষক অনেকাংশেই সফল হবেন বলে ধরে নেয়া যায়। সাক্ষাৎকার গ্রহণে যেমন বেশ কিছু সুবিধা আছে, তেমনি বেশ কিছু অসুবিধাও আছে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সেগুলো গুরুত্বের সাথে মনে রাখা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন –

১। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে:

ক. সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর গুণগত মান
খ. উত্তরদাতার গুণগত মান
গ. গবেষণাধীন সমস্যার প্রকৃতি
ঘ. উপরের সব।

২। অকাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারের _____ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ক. একটি
খ. দু'টি
গ. তিনটি
ঘ. চারটি

৩। সাক্ষাৎকার পদ্ধতির অন্যতম প্রধান সুবিধাটি হলো _____ ।

ক. অর্থ কম লাগে
খ. এর নমনীয়তা
গ. এর সংখ্যা বেশী থাকে
ঘ. সময় কম লাগে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ?

১। সাক্ষাৎকারের সুবিধাগুলো কী?

২। সাক্ষাৎকারের অসুবিধাগুলো কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সাক্ষাৎকার কী? সাক্ষাৎকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

২। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কার্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ - ৫

দলিলপত্র বিশ্লেষণ
Document Analysis

এই পাঠ শেষে যা জানা যাবে —

- দলিলপত্র বিশ্লেষণের গুরুত্ব
- দলিলপত্রের প্রকারভেদ
- দলিলপত্র গবেষণা প্রক্রিয়া
- দলিলপত্র বিশ্লেষণের সুবিধা ও অসুবিধা
- বিশ্লেষণের ধরণ
- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

দলিলপত্র বিশ্লেষণের গুরুত্ব (Importance of Document Analysis)

গবেষক সাধারণতঃ, তার নিজের উপাত্ত নিজেই সংগ্রহ ও সংগঠিত করতে পছন্দ করেন। এতে করে গবেষকের সুবিধাটি হলো যে, তিনি গবেষণাধীন বিষয়ে তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গবেষণা অনুকল্প অনুযায়ী, তার উপাত্ত সংগ্রহের প্রকৃতি ও কৌশলকে নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে, গবেষক এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন, যা তাকে উপাত্ত সরবরাহকারী কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ দেয় না। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। *প্রথমতঃ*, গবেষক নিজে উপাত্ত সংগ্রহ করতে গেলে, তা অনেক ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। *দ্বিতীয়তঃ*, গবেষণাধীন বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্যের লভ্যতা থাকলে, নতুন করে উপাত্ত সংগ্রহ অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর হয়ে পড়ে। *তৃতীয়তঃ*, গবেষণাধীন কোন ঘটনা যদি অতীতে ঘটে থাকে, তবে সেই ঘটনার উপর উপাত্ত সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। *চতুর্থতঃ*, প্রয়োজনীয় তথ্যের মাত্রা, বা ধরণও অনেক সময় গবেষককে সীমাবদ্ধ করে তুলতে পারে।

এ ধরণের পরিস্থিতিতে, অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ উপাত্ত সংগ্রহের বিকল্প হিসাবে, বিভিন্ন দলিলপ্রত্র ও ঐতিহাসিক উৎসে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ সকল উপাত্তের প্রকৃতি পরিসংখ্যানগত হতে পারে, আবার বর্ণনামূলকও হতে পারে। এ সকল দলিলপত্র ও ঐতিহাসিক উপাদান হতে পারে, আদমশুমারীর উপাত্ত, বিভিন্ন ধরণের দলিল-দস্তাবেজ, সরকারী নথিপত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, ব্যক্তিগত ডায়েরী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রচারমূলক সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, বই ও সাময়িকী, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আদালতের নথিপত্র, আইন ও বিধিমালা, আত্মজীবনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র, ইত্যাদিসহ ব্যক্তি বা সমাজ কর্তৃক সংরক্ষিত অসংখ্য উপাদান। বিদ্যমান, এ সকল উপাদানকে মাধ্যমিক উপাদান এবং এর উপর ভিত্তি করে গবেষক যে বিশ্লেষণ করেন, তাকে মাধ্যমিক বিশ্লেষণ বলে। তবে, দলিলপত্র বিশ্লেষণের উপযোগীতা অনেকাংশে নির্ভর করে, দলিলপত্রের যথার্থতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার উপর। যথার্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ উপাত্তের মাধ্যমে গবেষক নতুন অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন, অনুকল্প নির্মাণ, এমন কি অনুকল্প পরীক্ষাও করতে পারেন।

দলিলপত্রের প্রকারভেদ (Types of Documents)

দলিলপত্র বিশ্লেষণে, যে সকল দলিলপত্রাদি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো হলো:

- **সংরক্ষিত দলিলপত্র (Archival Records):** বিভিন্ন ধরণের দলিল-দস্তাবেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, আইন ও বিধিমালা, ডাক্তার, নার্স, সমাজ কর্মী ও হাসপাতালের সেবা-সংক্রান্ত নথি, বিভিন্ন সংগঠনের নথিপত্র, ইত্যাদি।
- **সরকারী দলিলপত্র (Public Documents):** আদমশুমারীর উপাত্ত, পরিসংখ্যানিক বর্ষপঞ্জী, আদালতের দলিলপত্র, কারাগারের নথিপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথিপত্র, ইত্যাদি।
- **ব্যক্তিগত দলিলপত্র (Personal Documents):** জীবন–ইতিহাস, ব্যক্তিগত রোজনামচা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্বীকারোক্তি, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ইত্যাদি।
- **প্রশাসনিক দলিলপত্র (Administrative Documents):** প্রস্তাবনা, অগ্রগতির প্রতিবেদন, আলোচ্যসূচী, সভার কার্য-বিবরণী, ঘোষণাপত্র, প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি।
- **গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রকাশনা (Research Reports and Publications):** তথ্যবিবরণী, জরিপ প্রতিবেদন, গবেষণা সাময়িকী, ইত্যাদি।
- **সাহিত্য ও গণমাধ্যমের প্রকাশনা (Literary and Media Publications):** পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি।

সময় ও ঘটনার সাথে ঘনিষ্টতার ভিত্তিতেও বিদ্যমান দলিলপত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

- **সমসাময়িক দলিলপত্র (Contemporary Documents):** যে সকল দলিলপত্র ঘটনা ঘটবার সময়ে সংকলিত করা হয়।
- **অতীত পর্যালোচনামূলক দলিলপত্র (Retrospective Documents):** যে সকল দলিলপত্র ঘটনা ঘটবার পরে তৈরি করা হয়েছে।
- **প্রাথমিক দলিলপত্র (Primary Documents):** যে সকল দলিলপত্র বর্ণিত ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সংকলিত হয়েছে।
- **মাধ্যমিক দলিলপত্র (Secondary Documents):** প্রাথমিক উৎস থেকে আহরিত দলিলপত্র।

দলিলপত্রকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় – সংরক্ষিত দলিলপত্র, ব্যক্তিগত দলিলপত্র এবং সরকারী দলিলপত্র।

যে মানদন্ডের ভিত্তিতেই দলিলপত্রকে শ্রেণী বিভক্ত করা হউক না কেন, আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সকল প্রকার দলিলপত্রকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করবো – সংরক্ষিত দলিলপত্র, ব্যক্তিগত দলিলপত্র এবং সরকারী দলিলপত্র। নিম্নে, এই প্রধান তিন ধরণের দলিলপত্রকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

সংরক্ষিত দলিলপত্র (Archival Records): সামাজিক গবেষণায় সংরক্ষিত দলিলপত্রের গুরুত্ব বিভিন্ন কারণে দিন দিন বাড়ছে। *প্রথমতঃ*, সরকারী অফিস, শিল্প কারখানা, বা অন্যান্য সংগঠন ইদানীং শুমারীর মাধ্যমে অধিক হারে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে। *দ্বিতীয়তঃ*, এর প্রতি জনগণ ও গবেষক সম্প্রদায়ের ক্রমর্বধমান আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সব তথ্য ক্রমাগত সুলভ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে কম্পিউটারের মাধ্যমে উপাত্ত সংরক্ষণ সহজ হয়ে উঠার ফলে। যেমন, ১৯৬০ সাল থেকে সংগৃহীত আমেরিকার আদমশুমারীর উপাত্তগুলো ব্যবহারের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন লাইব্রেরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাগারে অবমুক্ত করা হয়েছে। *তৃতীয়তঃ*, এ ধরণের উপাত্ত সংগ্রহের কাজে সামাজিক বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণও ক্রমাগত বাড়ছে বলে, সংগৃহীত উপাত্তসমূহের সাথে সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর সম্পৃক্ততাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সংরক্ষিত দলিলপত্রের উপাত্ত ব্যবহার করে ডুর্খেইমের আত্মহত্যার উপর সম্পাদিত গবেষণাটিকে, এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। ডুর্খেইম বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা, বা সামাজিক দলগুলোর মধ্যে আত্মহত্যার হারের বিভিন্নতা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার অনুকল্পটি ছিলো যে, সমাজে মানুষ নিজেকে অঙ্গীভূত করতে না পারার কারণে হয়তো মানুষ আত্মহত্যা করে। তার

মতে, এই অঙ্গীভূত করতে না পারাটি, মানুষের মনে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করে, যা তাকে আত্মহত্যা প্রবণ করে তোলে। অনুকল্পটি পরীক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিভিন্ন পারিবারিক অবস্থান, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ ও বিভিন্ন দেশের আত্মহত্যার হার নিয়ে গবেষণা করেন। ডুর্খেইম তার অনুকল্প পরীক্ষা করে আত্মহত্যা ও সামাজিক অঙ্গীভূতকরণের অভাবের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছেন। ডুর্খেইমের এই গবেষণাটি সম্পূর্ণভাবেই বিদ্যমান দলিল পত্রাদির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা সামাজিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত দলিলপত্র (Personal Documents): গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য কারো ব্যক্তিগত জীবনের লিপিবদ্ধ বর্ণনার উপর নির্ভর করতে পারেন। একে জীবন-ইতিহাস পদ্ধতিও (life-history method) বলা যেতে পারে। এখানে গবেষক সম্পূর্ণভাবেই কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বর্ণনার উপর নির্ভর করেন। সাধারণতঃ, এ সব বর্ণনা ব্যক্তি জীবনের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তোরণের কাহিনী হতে পারে (যেমন, কিভাবে একজন কিশোর অপরাধীতে পরিণত হয়), অথবা কোন ব্যতিক্রমী ধারায় যাপিত জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা হতে পারে (যেমন, একজন সমকামীর নিত্যদিনকার জীবন যাপনের বর্ণনা)। এ সব বর্ণনা মূলতঃ, একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সমন্বয়। সুতরাং, তথ্য সংগ্রহের নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিগুলোতে গবেষক তার গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি পান না, তা তিনি এই ব্যক্তিগত বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে লাভ করতে পারেন।

জীবন–ইতিহাস ব্যবহারের বিভিন্ন রকম কার্যকারিতা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, এটি একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাবনার প্রতি কোন ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে। *দ্বিতীয়তঃ*, পরবর্তীতে অধিক নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমানের ভিত্তি হিসাবে, জীবন-ইতিহাস ব্যবহারের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। এই অনুমানগুলো ঘটনার প্রেক্ষাপট, ঘটনার কারণ, বা অন্য কোন ফলাফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা, ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের উপর হতে পারে। *তৃতীয়তঃ*, খুব বিস্তারিত বর্ণনা থাকার কারণে, গবেষক এই তথ্যসূত্রের মাধ্যমে নতুন, বা ভিন্নতর কোন অন্তর্দৃষ্টি পেতে পারেন। *চতুর্থতঃ*, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ও ঘটনার গতিশীল প্রক্রিয়াকে বোঝার জন্য, জীবন-ইতিহাস হলো তথ্যের একটি বড় উৎস। জীবন-ইতিহাস তত্ত্ব গঠন, বা সাধারণীকরণের জন্য অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও পরবর্তীতে অধিকতর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য, এর বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে গবেষক কিছু সূত্র পেতে পারেন।

সরকারী দলিলপত্র (Public Documents): বিভিন্ন সময়ে সরকার তাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে। তবে, সে সব তথ্য সরকারীভাবে আদিকাল থেকে সংরক্ষণ করা হলেও তার প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ পূর্বে খুব একটা করা হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে এসেই এ সবের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃ, পূর্বে গবেষকদের ঐ সব তথ্যের পরিবর্তে, শুধু প্রকাশিত সরকারী দলিল, নীতিমালা, ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হতে দেখা যেতো। কিন্তু ইদানিং, একদিকে, গবেষকদের যেমন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ বেড়েছে, অন্যদিকে, তেমনি প্রতিটি বিষয়ে তথ্যেরও প্রয়োজন হচ্ছে। বাংলাদেশে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বহু মূল্যবান দলিলপত্র রয়েছে, অথচ সেগুলোর তেমন ব্যবহার হয়নি। সে সব লিখিত দলিলপত্র সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

দলিলপত্র বিশ্লেষণের এতসব কার্যকারিতা সত্ত্বেও এর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, তথ্যগুলো সংগৃহীত হয় অন্য কোন ব্যক্তি, বা সংগঠন কর্তৃক, যার সাথে গবেষকের কোন সম্পৃক্ততা থাকে না এবং তার উপর গবেষকের কোন নিয়ন্ত্রণও থাকে না। ফলে, এ রকম অনিয়ন্ত্রিতভাবে সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক ও দৈব-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তথ্য সংগ্রহকারী ব্যক্তি একটি ঘটনা সম্পর্কে তার নিজের সংজ্ঞা, নিজের পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করেন, যার সাথে পরবর্তীতে অন্যান্য গবেষকের চিন্তাভাবনার সমন্বয় নাও হতে পারে। গবেষককে তাই উপাত্তের

নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই করে নিতে হবে। এমন কি, উপাত্তের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় (অর্থাৎ, উপাত্তের প্রতিটি অংশের মধ্যে সমন্বয়) এবং বাহ্যিক সমন্বয় (অন্য কোন অভিজ্ঞতামূলক দলিল বা প্রমাণের সাথে সমন্বয়) পরীক্ষা করে নিতে হবে।

দলিলপত্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া (Process of Document Analysis)

দলিলপত্র বিশ্লেষণ কতগুলো ধারাবাহিক ক্রমপরম্পরায় পরিচালিত হয়। এই ধাপগুলো প্রচলিত গবেষণা নক্শায় অনুসৃত প্রক্রিয়ার মতই, তবে ক্ষেত্র বিশেষে, এর ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। দলিলপত্র বিশ্লেষণের প্রথম ধাপটি হলো, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের চিহ্নিতকরণ। প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের নির্বাচনটি নির্ভর করে গবেষকের ব্যক্তিগত আগ্রহ, দলিলপত্রের সহজলভ্যতা এবং সেগুলোর প্রতি সহজগম্যতার উপর। কোন গবেষণার জন্য কখনো একটি উৎসকে নির্বাচন করা হয়, আবার অন্য গবেষণার জন্য একাধিক দলিলপত্রকে নির্বাচন করা হয়। দলিলপত্রের ব্যবহার কখনো কোন বৃহৎ গবেষণার একটি অংশ হতে পারে (যেমন, গবেষণা সাহিত্যের পর্যালোচনা), অন্য সময়, সেটি একটি মূল গবেষণা হয়ে দাঁড়ায় (যেমন, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ)।

দলিলপত্র বিশ্লেষণের দ্বিতীয় ধাপটি হলো, উপাত্ত সংগ্রহ। উপাত্তের বিষয়বস্তু কি হবে, তা নির্ভর করে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র নির্বাচনের পাশাপাশি উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতির উপর। যদি গবেষণার উদ্দেশ্যটি হয় বর্ণনামূলক এবং পদ্ধতিটি হয় সম্পূর্ণভাবে গুণগত, সে ক্ষেত্রে দলিলপত্র অধ্যয়ন করে টোকা নেয়াই উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যখন বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মত পরিশীলিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তখন উপাত্তের সংগঠন ও বিশ্লেষণের জন্য পরিশীলিত ও জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় বলে, উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টি খুব সতর্কতার সাথে করতে হয়। উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা হলো দলিলপত্র বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ। দলিলপত্র গবেষণায় উপাত্ত বিশ্লেষণ বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। উপাত্তের মূল্যায়ন নির্ভর করে দলিলের প্রকৃতি, ব্যবহৃত পদ্ধতি ও গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর। যখন অনেক বেশী এবং বিভিন্ন ধরণের দলিলপত্র ব্যবহার করা হয়, তখন উপাত্ত বিশ্লেষণের বৈচিত্রটি জটিল রূপ ধারণ করে। সাধারণভাবে, গবেষণা শুরুর পূর্বে, বা পরিচালনার সময় যে সকল পূর্ব-ধারণা করা হয়, সে সকল পূর্ব-ধারণার সাথে উপাত্তসমূহ কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ, তা মূল্যায়ন করে দেখা হয়। বিশ্লেষিত ফলাফল ব্যাখ্যা করে তা দিয়ে পরিসংখ্যানগত সাধারণীকরণ করা যাবে কি না, তা নির্ভর করে কি ধরণের দলিলপত্র এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তার উপর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, আরোহী সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে, বিশ্লেষণগত সাধারণীকরণ করা যায়।

দলিলপত্র বিশ্লেষণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Document Analysis)

দলিলপত্র বিশ্লেষণের সবচেয়ে প্রধান সুবিধাটি হলো যে, বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান দলিলপত্রাদি এমন কিছু বিষয়ে গবেষণার সুযোগ প্রদান করে, যেগুলোর প্রতি সাধারণভাবে গবেষকের কোন সহজগম্যতা থাকে না এবং অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় না। *দ্বিতীয়তঃ*, দলিলপত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি গবেষককে অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয় ও ঘটনাবলী সম্পর্কে গবেষণার সুযোগ প্রদান করে। *তৃতীয়তঃ*, দলিলপত্রগুলো যারা রচনা করেন, তারা তা গবেষকের ফরমায়েশ ছাড়াই রচনা করেন বলে গবেষণার উপাদানগুলোর মধ্যে এক ধরণের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে। *চতুর্থতঃ*, অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতির তুলনায়, দলিলপত্র বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়সম্পন্ন হয়ে থাকে। *পঞ্চমতঃ*, অন্যান্য উৎসের অভাবে কখনো কখনো দলিলপত্রাদি উপাত্তের একমাত্র উৎস হয়ে থাকে। *ষষ্ঠতঃ*, যদিও দলিলপত্র বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে, কিন্তু দক্ষতাসম্পন্ন লেখকদের দ্বারা লিখিত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ অদক্ষ উত্তরদাতাদের দ্বারা পূরণকৃত ডাক প্রশ্নমালার উত্তরগুলোর তুলনায় অধিকতর মানসম্পন্ন হয়ে থাকে। *সপ্তমতঃ*, দলিলপত্রাদি যেহেতু অন্য উদ্দেশ্যে রচিত হয়, সেহেতু সেগুলো নৈর্ব্যক্তিক এবং পক্ষপাতহীন হয়ে থাকে।

সুবিধার পাশাপাশি, দলিলপত্র বিশ্লেষণের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। *প্রথমতঃ*, দলিলপত্রগুলো প্রতিনিধিত্বশীল হয় না, বলে সেগুলোর মাধ্যমে সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয় না। *দ্বিতীয়তঃ*, কিছু কিছু দলিলপত্র সহজে পাওয়া যায় না। যেমন, ব্যক্তিগত চিঠি, ডায়েরী, ইত্যাদি। *তৃতীয়তঃ*, কিছু কিছু দলিলপত্র অসম্পূর্ণ থাকে বলে সেগুলোর মাধ্যমে কোন উপসংহারে পৌছানো যায় না। *চতুর্থতঃ*, দলিলপত্রের মধ্যে বিভিন্নতা থাকার ফলে এগুলো মাঝে মাঝে তুলনাযোগ্য থাকে না। *পঞ্চমতঃ*, বিভিন্ন দলিলপত্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে থাকে বলে, এর মাধ্যমে উপাত্তের মধ্যে বিভিন্ন পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করে। *ষষ্ঠতঃ*, বিভিন্ন আঙ্গিকে এগুলো রচিত হয় বলে, এগুলো বিশ্লেষণের জন্য সাংকেতীকরণ, প্রমিতকরণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা তৈরি করে।

বিশ্লেষণের ধরণ (Forms of Analysis)

দলিলপত্র বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরণগুলো হলো, গুণগত বিশ্লেষণ, পরিমাণগত বিশ্লেষণ, বর্ণনামূলক-তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। গুণগত বিশ্লেষণে, গবেষক দলিলপত্রে বিদ্যমান তথ্যগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং ব্যাখ্যা করেন। তিনি গবেষণার বিষয়ের উপর প্রধান প্রসঙ্গ, ধারণা, বক্তব্য এবং চিন্তাগুলোকে নির্ধারণ করেন। দলিলের প্রধান বিষয়বস্তুকে অনুসন্ধান করেন। যেমন, কে দলিলটি রচনা করেছেন? কখন করেছেন? দলিলের উৎসের নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু? ইত্যাদি। এ সব বিষয় অনুসন্ধানের পর, তিনি প্রাসঙ্গিক উপসংহারে পৌঁছেন। তবে, গুণগত পদ্ধতিতে পরিচালিত দলিলপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত উপসংহারগুলো সাধারণীকরণের জন্য সীমাবদ্ধ। দলিলপত্র নিয়ে গুণগত বিশ্লেষণে যে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়, পরিমাণগত বিশ্লেষণেও সে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। কিন্তু পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের নক্শাটি গুণগত বিশ্লেষণের তুলনায় অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট এবং কাঠামোবদ্ধ হয়ে থাকে। উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতিটি থাকে পরিমাণগত প্রকৃতির এবং উপসংহারগুলো আরোহীমূলক সাধারণীকরণকে নির্দেশ করে।

দলিলপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে যে সব ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণা করা হয়, বর্ণনামূলক-তুলনামূলক বিশ্লেষণে, গবেষক সে সকল ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক বা অন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা, বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তুলনা করেন।

দলিলপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে যে সব ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণা করা হয়, বর্ণনামূলক-তুলনামূলক বিশ্লেষণে, গবেষক সে সকল ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক বা অন্তঃসাংস্কৃতিক তুলনা, বা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তুলনা করেন। দলিলপত্রের অন্য কোন ধরণের বিশ্লেষণ না করে, সাধারণতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এ ধরণের বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়। দলিলপত্র ব্যবহার করে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে আরো জটিল ও পরিশীলিত বিশ্লেষণ করা হয়। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি দলিলপত্রের প্রকাশিত ও সুপ্ত উভয় ধরণের বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করে বিষয়বস্তুর অর্থ, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ, ইত্যাদিকে অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। দলিলপত্র বিশ্লেষণের পরিশীলিত প্রকরণ হিসাবে আমরা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয়বস্তু বিশে- ষণ হলো, কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা, বিষয়বস্তু, শব্দ, বা যে কোন বক্তব্যকে নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বক্তৃতা, দলিল এবং অন্যান্য লিখিত মাধ্যমকে ব্যবহার করে গবেষণার একটি কৌশল।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ হলো, কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা, বিষয়বস্তু, শব্দ, বা যে কোন বক্তব্যকে নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বক্তৃতা, দলিল এবং অন্যান্য লিখিত মাধ্যমকে ব্যবহার করে গবেষণার একটি কৌশল। যে সব গবেষক প্রথাগতভাবে পরিমাণগত অনুকল্প পরীক্ষায় আগ্রহী, তারা গুণগত বর্ণনায় স্বস্তি বোধ করেন না। এ সকল গবেষকের জন্য, গুণগত বর্ণনাকে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ একটি যথাযথ গবেষণা কৌশল হতে পারে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্যটি হলো, মৌখিক অপরিমাণগত দলিলকে নিয়ে পরিমাণগত উপাত্তে রূপান্তর ঘটানো এবং সেই উপাত্তকে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করে অনুকল্প পরীক্ষা করা। অনুকল্প পরীক্ষা ছাড়াও, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলো, বিষয়বস্তুর মধ্যে ধারা বর্ণনা করা, উৎসের জ্ঞাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সকল উৎস যে বক্তব্যের জন্ম দেয়, তার সাথে সম্পর্কিত করা, প্রতিষ্ঠিত মানদন্ডের বিপরীতে যোগাযোগের বিষয়বস্তুকে পরখ করে শুদ্ধ করে নেয়া, বিষয়বস্তু রচনায় যে কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করা, এবং রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ ও যোগাযোগের রূপকে বর্ণনা করা।

আধুনিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ অনেক বেশী সুসংহত এবং এতে সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রয়োগকে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সাধারণতঃ, গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোন বিষয়বস্তুকে নিয়মবদ্ধভাবে বিশ্লেষণের জন্য একটি গবেষণা কৌশল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে, গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্কিত নয়, এমন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও এই কৌশলটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পন্ডিতগণ বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে উপসংহার টানার কৌশলকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ বলে। এই বক্তব্যগুলো সংবাদপত্র, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, রোজনামচা, বক্তৃতা, গ্রন্থ, কবিতা, গান, ছবি, ইত্যাদির মধ্যে বিধৃত থাকতে পারে। এই কৌশলটির বিকাশ মাত্র কয়েক দশকের হলেও সামাজিক বিজ্ঞানীরা এই কৌশলের অন্তর্নিহিত প্রত্যয় ও ধারণাসমূহ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন। তবে, আধুনিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ অনেক বেশী সুসংহত এবং এতে সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রয়োগকে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক অনুশীলনে, গবেষকগণ সময়ের আবর্তে বক্তব্যের গুণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন, বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা, বক্তব্য প্রদানকারী সম্পর্কে উপসংহার টানা, বিভিন্ন সমাজের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, বা সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে অনুকল্প পরীক্ষা ও বক্তব্যের প্রভাব সম্পর্কিত অনুকল্প পরীক্ষার জন্য, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কৌশলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বিশ্লেষণের একক নির্বাচন, নমুনায়ন ও সাংকেতীকরণ (Selection of Units of Analysis, Sampling and Coding): সাংকেতীকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণের শ্রেণী বা গোষ্ঠীগুলো নির্ধারণের পূর্বে গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, দলিলের কোন বিষয়গুলোকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাধারণভাবে, চারটি বিশ্লেষণের একক রয়েছে: একটি শব্দ, একটি বিষয়, একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও একটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ। প্রায়শঃ, একটি শব্দকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। একটি দলিলে, বিশেষ একটি শব্দের উপস্থিতিকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাংকেতীকরণের মাধ্যমে একটি বিন্যাস তৈরি করা হয়। যা পরিমাপ করা হবে, তার জন্য যদি একটি শব্দ একটি যথার্থ সূচক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সেই শব্দটি বিশ্লেষণের একক হিসাবে উত্তম নির্বাচন বলে বিবেচিত হবে। যেমন, কোন লেখকের উপন্যাসে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, নারী ও পুরুষের মধ্যে কথোপকথনের সময় কার বক্তব্যটিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, সেটি শ্রেণীবদ্ধ করলে সেই উপন্যাসে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে, নারীর ক্ষমতায়ন পরিমাপে 'সিদ্ধান্ত' শব্দটি বিশ্লেষণের একক হিসাবে যথাযথ হতে পারে। একইভাবে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলো অধ্যয়ন করে সামাজিক সংস্কারের বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। কোন দলিলে বিধৃত বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করেও সমাজের বিভিন্ন ঘটনা, বিষয়, প্রপঞ্চকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেহেতু কোন বাক্য বা অনুচ্ছেদে একের অধিক ধারণা অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেহেতু সেগুলো বিশ্লেষণের একক হিসাবে ব্যবহার করলে বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। এর ফলে, নির্ভরযোগ্যতার মাত্রাও কমে যায়। তবে, তাত্ত্বিক ও প্রত্যয়গত বিবেচনায় এগুলোকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে নির্বাচনের গুরুত্ব রয়েছে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে, নুমনায়নের ধারণাটি অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির মতই। অনেক সময়, বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু এত বেশী থাকে যে, এর সবগুলোকে নিয়ে গবেষণা করা অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, একজন গবেষক যদি পত্রিকায় হত্যাকান্ডের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো নিয়ে গবেষণা করতে চান, সে ক্ষেত্রে গবেষক কি সব পত্রিকাকে বিবেচনা করবেন? সব ধরণের হত্যাকান্ডকে বিবেচনা করবেন? রাজনৈতিক হত্যাকান্ড হলে কি সব দলের কথা বিবেচনা করবেন? না কি এর কিছু অংশকে নির্বাচিত করে গবেষণা পরিচালনা করবেন? পত্র পত্রিকায় এ সকল সংবাদ এত বেশী থাকে যে, গবেষণাকে সংহত ও সুসংগঠিত করার জন্য নমুনায়নই শ্রেষ্ঠ পথ। গবেষক সবচেয়ে বেশী প্রচারিত পাঁচটি দৈনিক পত্রিকাকে নির্বাচন করতে পারেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক হত্যাকান্ডকে বিবেচনা করতে পারেন এবং শুধুমাত্র দলীয় অন্তর্দ্বন্দের ফলে সংঘটিত হত্যাকান্ডকে বিবেচনা করতে পারেন। তবে, এটি গুরুত্বের সাথে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নির্বাচিত নমুনাকে অবশ্যই প্রতিনিধিত্বশীল হতে হবে, যাতে করে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের প্রধান কাজটি হলো, একটি সাংকেতীকরণ বিন্যাসকে তৈরি করা, যা লভ্য দলিল বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কি ধরণের দলিল ব্যবহার করা হচ্ছে, বা কি ধরণের অনুকল্প পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার উপর এই সাংকেতীকরণ বিন্যাসের ধরণটি নির্ভর করে।

যে কোন কর্মকান্ড যখন কোন দলিলে বিবৃত করা হয় (যেমন, একটি গ্রন্থ, রোজনামচা, ঘটনা লিপি, চলচ্চিত্র, বা ধারক যন্ত্র), তখন তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রতি প্রযোজ্য হয় এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি দলিলের প্রতীকী বিষয়বস্তুকে (যেমন, শব্দ বা অন্য কোন প্রতিরূপ) গুণগত ও বিশৃঙ্খল রূপ থেকে পরিমাণগত ও শৃঙ্খলিত রূপে রূপান্তরিত করা হয়। অন্য কথায়, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণকে এক ধরণের সাংকেতীকরণ প্রক্রিয়া বলা যায়, যা বিভিন্ন উপাদানকে কতগুলো সীমিত শ্রেণী, বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। অতএব, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের প্রধান কাজটি হলো, একটি সাংকেতীকরণ বিন্যাসকে তৈরি করা, যা লভ্য দলিল বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কি ধরণের দলিল ব্যবহার করা হচ্ছে, বা কি ধরণের অনুকল্প পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার উপর এই সাংকেতীকরণ বিন্যাসের ধরণটি নির্ভর করে। অন্যান্য গবেষণায় ব্যবহৃত বিদ্যমান সাংকেতিক বিন্যাসকে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে একদিকে, গবেষকের জন্য অনেক সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হতে পারে এবং অন্যদিকে, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ফলাফলকে অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের সাথে তুলনাযোগ্য করে তুলতে পারে। কিন্তু বিদ্যমান সাংকেতীক বিন্যাসগুলো সবসময় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে, একটি নতুন সাংকেতীক বিন্যাস তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের এই বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য গবেষণা নক্শা বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Content Analysis): বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সময় ও অর্থের দিক থেকে সবচেয়ে মিতব্যয়ী একটি কৌশল। কারণ, *প্রথমতঃ*, একজন গবেষক মাত্র কিছু দলিল-পত্র, বা পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে একটি গবেষণা সম্পন্ন করতে পারেন। *দ্বিতীয়তঃ*, বিভিন্ন দলিলে বিধৃত বিষয়গুলো প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে থাকে। কারণ, যারা এই দলিল, প্রতিবেদন, উপন্যাস, ইত্যাদি প্রস্তুত করেন, তারা সামনাসামনি উপস্থিত থাকেন না এবং যখন তারা এগুলো প্রস্তুত করেন, তখন তারা জানেন না যে, এগুলো কখনো কোন গবেষক ব্যবহার করবেন। ফলে, গবেষকের সাথে উপাত্ত সরবরাহকারীর কোন মিথষ্ক্রিয়া না হবার ফলে, সেগুলো পক্ষপাতমুক্ত হয়ে থাকে। *তৃতীয়তঃ*, যত্ন সহকারে কোন দলিল, বা প্রতিবেদন সংরক্ষণ করলে সেগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফলে, সাধারণ গবেষণার মাধ্যমে যে সকল উপাত্ত সহজলভ্য নয়, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষক সে ধরণের উপাত্তকে সহজে পেতে পারেন। *চতুর্থতঃ*, বহু প্রতিবেদন এবং দলিলে পরিসংখ্যানিক তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে, যা দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে, এ সকল দুর্লভ ও অগম্য উপাত্ত প্রাপ্তি সহজ হয় বলে দীর্ঘদিন পূর্বে মানুষের আচরণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল, সে সব বিষয়ের উপর দীর্ঘকালীন ও ধারা গবেষণা করা সহজ হয়। *পঞ্চমতঃ*, যেহেতু বহু ধরণের দলিল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, সেহেতু ফলাফলের উপর আস্থা ও নির্ভরযোগ্যাতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি না করেই বৃহৎ আকারের নমুনা ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের কিছু অসুবিধা রয়েছে। *প্রথমতঃ*, যেহেতু বিভিন্ন দলিল-পত্র গবেষণার উদ্দেশ্যে রচিত না হয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে রচিত হয়, সেহেতু সেগুলোর গুণগত মান সবসময় গবেষণার উপযোগী থাকে না। *দ্বিতীয়তঃ*, বিভিন্ন দলিল-পত্র, বিশেষ করে ঐতিহাসিক দলিল-পত্র, অনেক সময় অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। এ সব অসম্পূর্ণতার প্রভাব গবেষণার উপর কতটুকু পড়ে, তা প্রায়শঃ জানা যায় না। *তৃতীয়তঃ*, সময়ের আবর্তে পরিবর্তন ঘটে এবং সে সকল পরিবর্তন দলিলপত্রে বিদ্যমান উপাত্তের তুলনাযোগ্যতাকে কমিয়ে দেয়। *চতুর্থতঃ*, বিভিন্ন দলিল-পত্র গবেষণার উদ্দেশ্যে তৈরি না হয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি হয় বলে, এটি নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, সেগুলো বস্তুনিষ্ঠ। *পঞ্চমতঃ*, ভুল, বা অযথাযথ নমুনায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও বস্তুনিষ্ঠ উপাত্তের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করে বিভ্রান্তিকর ফলাফলের জন্ম দিতে পারে। *ষষ্ঠতঃ*, এই কৌশল শুধুমাত্র লিখিত, বা প্রকাশিত তথ্য নিয়েই গবেষণা করতে সাহায্য করে। কিন্তু কোন সমস্যার উপর সম্পূর্ণ গবেষণা করতে হলে শুধুমাত্র প্রকাশিত তথ্যের উপর নির্ভর করলেই চলবে না । লিপিবদ্ধ হয়নি এমন বিষয় ও ঘটনাও গবেষণা জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই কৌশলে তা বিবেচনায় আসে না। *সপ্তমতঃ*, এ কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

সারাংশ

দলিলপত্র বিশ্লেষণ সমাজ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পুরোনো দলিল, চিঠি-পত্র, ডায়েরী, ইত্যাদি দলিলপত্র বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সাধারণতঃ, যে সব গবেষণায় সমাজ-ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়, সে সব ক্ষেত্রে গবেষক প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজকে গবেষণার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে উপসংহারে উপনিত হন। এ ধরণের গবেষণার অন্যতম অসুবিধা হলো, প্রাপ্ত তথ্যকে সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয় না। বর্তমান পাঠে, দলিলপত্রের গুরুত্ব, প্রকারভেদ, সুবিধা-অসুবিধা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। পাঠ শেষে, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন –

১। দলিলপত্র বিশ্লেষণের প্রথম ধাপটি হলো:

ক. দলিলপত্র সংগ্রহ করা ও সংরক্ষণ করা
খ. দলিলপত্রগুলোর আলোকে তথ্য তৈরি করা
গ. প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র চিহ্নিত করা
ঘ. উপরের সব।

২। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও ঘটনার গতিশীল প্রতিক্রিয়াকে বোঝার জন্য _____ হলো তথ্যের একটি বড় উৎস।

ক. পুরোনো শিলালিপি
খ. পুঁথি সাহিত্য
গ. জীবন-ইতিহাস
ঘ. উপরের সব

৩। দলিলপত্র বিশ্লেষণের অন্যতম অসুবিধা হলো:

ক. সাধারণীকরণ করা সম্ভব হয় না
খ. সহজে পাওয়া যায় না
গ. তুলনাযোগ্য করা যায় না
ঘ. উপরের সব।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দলিলপত্র বিশ্লেষণের সুবিধা কী?

২। দলিলপত্রের প্রকারভেদগুলো কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সমাজিক-ইতিহাস গবেষণায় দলিলপত্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনায় দলিলপত্রের গুরুত্ব আছে কি? আলোচনা করুন।